প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৬০
প্রকাশক : ধীরা চৌধুরী, স্বরলিপি
২৩ এ, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলকাতা-১

ছেপেছেন :—এ, চ্যাটার্জী, প্রিন্টো ক্রাফ্‌ট্‌

দিব্যেন্দু-কে

পদ্যাপদ্য সম্পর্কে সামান্য

গদ্যে কিছু অনুরুদ্ধ লেখা, এমনকি চিঠিপত্র, তৈরি করতে গেলেও গায়ে জ্বর আসে আমার। তেমন সঠিক গন্ধ যখন-তখন পাই না; একবার হয়তো বা বাল্যকালঘেঁষা সময়ে পেয়েছিলাম—তাই একটা ঘোরের মধ্যে 'কুয়োতলা' নাম্নী গদ্যরচনা লিখে বসেছিলাম।

বাড়ির ইচ্ছা, সবার যেমন থাকে, আমারও ছিলো। পরান্নজীবী আমি ছোটবয়েসেই, পিতৃহীন। মনের মধ্যে তেমন পরাপর ব্যাপারটা ছিলো না বলেই হয়তো বা একদিন থেকে বহুদিন কম্যুনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে, কিছুকাল বা আপন খেয়াল খুশিতে, প্রেমে বা প্রেম-প্রকারে নিজেকে বয়ে যেতে দিয়েছিলাম। দায়িত্বশীল হয়ে ওঠার কথা আমার তৎক্ষণাৎ। সবাই হয়। আমি হতে পারি নি। নিজেকে এক মাতুলের কল্পিত ধনসম্পদ-সিংহাসনে বসিয়ে আয়নার মুখোমুখি থাকতাম। থাকতাম কি? তাহলে তো দুর্ভাগ্য আজ এতোদূর গড়াতো না।

আমার ভেতরে একটা দ্রব্যের হদিশ আমি পেয়েছিলাম, তা হলো, যখন যে কাজে হাত দিয়েছি তাকে ধরেছি প্রাণপণ। তাই কম্যুনিস্ট পার্টি, প্রেমভালোবাসা প্রভৃতি যখনকার যা, তাতে আকণ্ঠ ডুবে থেকেছি। চতুষ্পার্শে দৃকপাত করিনি। কিন্তু এসবই শিবের গীত, আসল ধানভানা যথাশীঘ্র শুরু করার দরকার।

পদ্য খুবই আকস্মিকভাবে লিখে ফেলেছি। তখন নামকোয়াস্তে প্রেসিডেন্সি কলেজে আছি। কলেজ থেকে কলেজের বাইরে ঘোরাফেরাই অধিক। ছাত্র মন্দ ছিলাম না, আজ মনে পড়ে, কিন্তু ছাত্রগতগুণ আমার শেষদিকে ঘুচে এসেছিলো। তাও কমলি ছাড়ে নি, পরীক্ষা দিতে বসেছি, উঠে এসেছি, বাড়ি থেকে পালিয়ে লুকিয়ে থেকেছি। জন্মগত সংস্রবের কথা যেন আমি ভুলেই যেতাম মাঝেমধ্যে। তখন মামাবাড়ি থেকে আলাদা হয়ে উল্টোডাঙার বস্তির মতন বাসায় উঠে গেছি। সংসার ছোটভাই-এর। আমি সেই ভ্রাতৃ-হোটেলে প্রায় নিখরচায় থাকি। দু দুবার চাকরি করতেও গেছি। একবার শ্যাক্সবি ফারমার, অন্যবার হিন্দুস্তান মোটরস-এ। অন্তত দ্বিতীয়

চাকরি ছিলো খুব ভালো আর বড়ো ধরণের। গলায় নেংটি না লাগালে চলতো না। লেগে থাকলে আজ পাকা সাহেব বনে যেতাম। গাড়ি-বাড়ি সমেত বড়োবাড়ির মহিলা এবং ডজনখানেক বালবাচ্চা! নাতিপুতি? তাও হয়ে যেতে পারতো বা পারতো না!

ছেড়ে দিয়েছিলাম, অর্থাৎ না যেতে শুরু করলাম। মা দু একবার, বোধকরি, স্মরণ করিয়েছিলেন। তারপর আর কিছু বলেন নি। আমি, বলতে গেলে, তখন থেকেই আমার একধরনের নিজস্ব জীবনযাপন শুরু করি। অহোরাত্র মদ খাই, অহোরাত্র পদ্য লিখি। অল্পবিস্তর দাড়ি চোয়ালে। লোকে বলত, একদম 'আউট্' হয়েছি! কেউ বলে প্রেমে-বিফল, কেউ বলে প্রেম-নাম্নী বস্তুটির কাছাকাছিই পৌঁছইনি। যা বলে লোকে আমি শুনি তার একাংশ। শুনি আর কালা হতে থাকি। একসময় স্বেচ্ছায় কালা, কানা, আউট্, এই সমস্তই হয়ে যাই। ভালোবাসতাম? সত্যি বলতে গেলে আজ, বাসতাম না, একথাটিই মনে পড়ে। কেননা, আমি আমার চরিত্র ইতিমধ্যে পরিপূর্ণভাবে বুঝে গিয়েছিলাম—ভালোবাসলে তাকে ঘাড় ধরে বুকের কাছে, তথা পায়ের কাছে এনে ফেলতামই।

কম্যুনিস্ট পার্টি ছেড়েছি। ওঁরা খুব তেড়ে ধরার পরিকল্পনা করেছিলেন বলেই হয়তো বা। তাছাড়া তখন আমি বুঝতে শুরু করেছিলাম, আমি অসামাজিক। ফলত সমাজ নামক বিশ্বমানবকল্যাণের কর্ম আমার দ্বারা হবে না। নোংরা রাজনীতিকে ঘেন্না করতে শিখেছিলাম।

তখন ঘুরে বেড়াই, শুধু ঘুরতেই ভালোবাসি। কাঁধে ব্যাগ-ভর্তি তাড়াতাড়া পদ্য। লোকজনকে ধরে-বেঁধে শোনাই। আমার তখনকার ঘনিষ্ঠ বন্ধু তন্ময় সন্দীপ আর সুনীল দীপক। ওদেরই ভরসাপূর্ণ কথায় তর-তর করে পদ্য লিখি। দেশ নামক সাপ্তাহিকে পাঠাই। ফেরত পাই। তখন আমার পদ্য সাগ্রহে ছাপতেন অগ্রণী-র প্রফুল্ল রায় উত্তরসূরী ও সাহিত্যপত্র। জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় আর আশীষ বর্মন, আমার বন্ধুমহলের বাইরে, আমাকে লুকিয়ে সাহায্য করতেন সাহিত্যব্যাপারে; পরে জেনেছি। আর প্রশ্রয় পেয়েছি শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর কাছ থেকে। কবিতা-য় তিনি আমার প্রথম পদ্য থেকে শুরু করে অনেক ছেপেছেন, যতদিন কবিতা পত্রিকা বেঁচেছিলো, ততোদিন প্রায় প্রতি সংখ্যায় লিখেছি। উনি আমার ব্যবহারিক জীবনেও সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন—ওঁর প্রীতিপূর্ণ কথায় আমি 'তুলনামূলক সাহিত্য' পড়তে শুরু করেছিলাম যাদবপুরে।

আমি যখন লিখতে শুরু করি তখন, এখন যাঁদের দশক-ওয়ারি নাম পঞ্চাশ, তাঁরা অনেকেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের অনেকেই আমার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, অনেকে ছিলেন বাস্তবিক বন্ধু।

তারপর একদিন, কী ভাবে যে প্রকৃতপক্ষে একা হয়ে গেলাম। সবাই একদিন একা হয়। এতে বৈশিষ্ট্য নেই কিছুই। তবে আজন্মই একা ছিলাম আমি—এখন সেই একাকিত্বেও ভাঙন ধরলো। একার থেকেও একাতম হলাম। পদ্য আমি আকাশ বাতাস জল হাওয়া থেকে কুড়িয়ে পাইনি কোনোদিন। অনেকের যেমন পংক্তির পর পংক্তি অনায়াসে চলে আসে, আমার অভ্যাস তেমন নয়। লিখতে বসলে তবেই লেখা! তার আগে আমি কেমন যেন! যখন লিখতে বসতাম, তখন জলের মতন অনর্গল পদ্য—এমনকি একটি বসায়, পঁচিশ-তিরিশ পদ্য লিখে চিৎপাত হয়েছি। পদ্য লেখার পর আমার আর কোনো কায়িক শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। তখন আমি শক্তি-র মড়া। যখন পদ্য লিখি, মনে হয় আমি পাঁকজলে ডুবি। তখন আমার চেহারা, মনে হয়, বদলে যায়। মনে মনে কতো গালমন্দ করি, কতো ভালবাসার কথা বলি, কতো ক্ষমা করি চতুর্দিক—এইসব করি। তখন পরিচিত কেউ আমায় লুকিয়ে দেখে, পাগল বলেছেন। পাগল বা ভূতগ্রস্ত।

আমি একধরনের ঈশ্বর বিশ্বাস করি। ঈশ্বর মানে বড়ো, যে আমার কথা শোনে, আমাকে শোনায়। সেই ঈশ্বর—মধ্যরাতে যখন আমি অন্ধকার চৌরঙ্গী পার হই বা ট্রামলাইন ধরে দিই উন্মত্ত দৌড়—সঙ্গে থাকেন। আমার পদ্যের তিনি, তুমি, সে—অধিকাংশ তাঁকেই উদ্দেশ ক'রে লেখা। প্রকৃতপক্ষে কোনো মেয়েমানুষ বা ছেলেমানুষ নয়! হলেও—তিনি থাকেন আড়ালে।

এ-পদ্য ভালো লিখেছি, ও-পদ্যটা ঠিক জমেনি—একথায় মনে মনে হাসি আমি। কেননা, বস্তুত, যে কোনো লেখকের পদ্যই দীর্ঘ কাব্য—তিনি লেখেন টুকরো টুকরো ক'রে, এইমাত্র। দেখতে হবে, তিনি আদপে লেখক কিনা।

হাতছানি, নীল হাতছানি/১
তুমি আছো—ভিতের উপরে আছে দেয়াল/৬
জানেন ও কে/৯
আমাদের সম্পর্ক/১০
পিছনে চলেছে, থাকে দূর/১২
শুনেছিলাম, সঙ্গে আছেন/১৪
নিজস্ব অন্তরে/১৫
দূরে ঐ যে বাড়িটা/১৬
নষ্ট মানুষ/১৮
ঐ গাছ/১৯
কাগজের নৌকা/২০
দুঃখ আমার/২১
এভাবে হয়/২২
অন্ধকারে/২৩
হারাতে হারাতে তাকে/২৪
কে যায় এবং কে কে/২৬
আর কিছু নয়/২৭
দরোজা/২৮
একদিন/৩০
সশস্ত্র ও অস্ত্রহীন/৩১
পরশুরাম/৩২
মানুষের মধ্যে থেকে/৩৪
হৃদয়, স্মৃতি, স্বদেশ/৩৫
সেই দুটি হাত ছোটে/৩৬
রাখো তোমার উদ্যত পা/৩৮
শুয়ে আছি/৪০
অন্ধকার দেয় তারো বেশি/৪২
ঘরে ফেরা/৪৩
কেন যাবে/৪৫
সে এসে দাঁড়িয়ে আছে/৪৬
কৌটো আর সিঁদুরদান/৪৭

তুমি যেন গাছ/৪৯
এবার থেকে/৫১
সুন্দর/৫৩
আপন মনে/৫৪
সম্পর্ক/৫৫
অসুখ/৫৬
দিগন্তে, মাঠের প্রান্তে/৫৭
আমিও/৫৮
বাইরে বৃষ্টির শব্দে/৫৯
এরপর ওখানে রাখে না/৬০
ভাঙাবাড়ি সেদিন আরো দুরূহভাবে ভেঙে গেল/৬১

হাতছানি, নীল হাতছানি

হাতছানি, নীল হাতছানি দূর থেকে—আমলকি ফলের মতো স্বচ্ছ
নীল ভুঞ্জুদের মাঠ, ইটকাঠ, খরস্রোতা বেজি
বাল্যকাল—তৈমুর ! তৈমুর !

□

পদ্যটা শুরু করেছিলুম 'শিলচরে নীল চাঁদ—' এই বলে। কিন্তু, অবুঝের মতো সরে এলুম। হয়তো নীল চাঁদ মানে শান্তি ও ছুটির নিমন্ত্রণ। শিলচরে যুগলবান্ধবীর কাছে গিয়ে পড়ার প্রচুর বাসনা ছিলো। যেহেতু যাওয়া হলো না—মনে হয়—সেহেতু পদ্যর অমন ধরতাই, ছিন্নভিন্ন ক'রে—শুদ্ধ ও সাধারণ 'হাতছানি, নীল হাতছানি' লিখি, তারপর, হাতছানি কখনো কাছের নয়, সেভাবে দূরের, 'দূর থেকে' শব্দ। আমলকি ফলের সঙ্গে বাল্য বিজড়িত। বাল্যের গণ্ডগ্রাম বহড়ু, তারও দক্ষিণপাড়া, পোড়ো জমিদারবাড়ি, ভুঞ্জুদের গোট (গেট্ নাকি !)—খরস্রোতা শব্দটা কিছুতেই সে সময় বেজি দেখে মনে পড়ে নি—এতাবৎকাল চারপাশ ঘুরে—যা হারিয়ে যায় তারই নাম খরস্রোতা (নারী নাকি !), ভেবেই আমার প্রিয় বেজি-পালনের বিশেষণ হিসেবে বসিয়েই, হাতে কঞ্চি আর সপাংসপাং ভাটবনসংহার, রমেশ মজুমদারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—তাই অত্যাচারী আর আহাম্মুক 'তৈমুর' নামে নিজেকেই চিৎকার ক'রে ডাকি। সেকালে এসব সম্পাদ হতো। তৈমুর প্রকৃতপক্ষে সেকালে, তৎক্ষণাৎ না ভেবে থাকলেও, হয়তো ভেবেছিলুম, বৈরাম খাঁ, কিংবা পৃথ্বীরাজ (না পৃথ্বীরাজ আরো পরে ভেবেছি, যখন, গগনে গগনে আপনার মনে কী খেলা—শুনি) রাণা প্রতাপ—আজ লিখে ফেলেই মনে হচ্ছে খোড়া তৈমুর সব চেয়ে লাগসই, সুতরাং সাক্ষ্যপ্রমাণহীন, তৈমুরই ভেবেছিলুম, বলা যায়।

আজ ২০শে মে সকালবেলা, সমস্ত কলম (ঝর্ণা কলম আর বোধহয় পাওয়া যাবে না কোনোদিন—এক সময় পাওয়া যেতো) হারিয়ে ফেলে উড-পেন্সিলে খস্ খস্ ক'রে লিখে চলেছি—ডিকটেশান নিচ্ছি যেন—কেননা পদ্য লিখতে বসেও, আমি জানি না, কী লিখতে হবে বা কী লিখতে চাই—অনেকেই জানে। পদ্য লিখতে বসার আগের মুহূর্তে আমি পাতার চতুর্দিকে হিজবিজবিজ—ইকড়িমিকড়ি চামচিকড়ি কাটি। মানুষের চিহ্ন ফুটে উঠতে না উঠতেই চিবুক

ভরে দাড়ি তৈরী করে দিই—আয়না-আর্শির বদলে আমার ঐসব ভালো লাগে—কখনো পেয়ালাপিরিচ আঁকতে পারি নি। তো, যাই হোক। তৈমুর! তৈমুর —এর পর কিছুটা অন্তত পদ্য অর্থাৎ সারবন্দী শব্দ লিখতে হবে—যতো সংক্ষিপ্ত হয় –

এখন প্রস্তুত আমি ভাটফুল, রাস্তার কুকুর—বিবেচনা ডাস্টবিনে
তালবীথি, সনাক্ত তালগাছ—বাজ পড়ে সুস্থতা গিয়েছে
তবু স্বাধীনতাপ্রিয়, করকোষ্ঠীসমেত ধরেছি কামড়ে শুধু—
পোস্টার! পোস্টার!

□

দ্বিতীয় অংশে বিশেষ কিছু খুলে বলার নেই।

তৈমুর! তৈমুর!—পোস্টার! পোস্টার! কিশোর বয়সে কলকাতায় এসে দেয়ালভরা বলবানের কাঁধে হাতা, ঘোড়ার গুয়ের একটানা গন্ধ, শেয়ালদা স্টেশন—তার সামনে প্যাসিংশোর গাল-মচকানো সায়েব—এইসব দেখেছিলুম। উল্টোমুখে ট্রাম থেকে নেমে, হাত পা ছড়ে, যাতে কালি আর কিঞ্চিৎ রক্ত মুছেছিলুম—তা হলো পোস্টার! সে রকম হরেক পোস্টারে গা মুড়ে একদিন কম্যুনিস্ট পার্টি—সেই থেকে বহুদিনই কম্যুনিস্ট পার্টি—তখন ছিলুম পদ্য-গদ্যর বিরুদ্ধে, কেবল বিপ্লব, শুধুই বিপ্লব আর সার্বজনীন সুখশান্তি! আজ নিজ মনের শান্তি আর সুখ খুঁজতে ছুটেছিলুম শিলচর। ভাগ্যিস, গিয়ে ভুল ভাঙে নি—যদি ওখানে সুখ পাওয়া না যেতো!

আবার নোঙর তুলে নিলে হয়—জলের বেদনা একা জল বুঝবে—
অসীম রোদন

নৌকায় অনেক কাল ভাসা হলো
এখন স্থগিত
ঘাটের সিঁড়ির মতো হয়ে যাবো —পাথর ! পাথর !

□

এক সময় ধলভূমগড়ে দৌড়ে বেড়াতে গিয়ে ফিরিঅলাকে পাথর ফিরি করতে শুনেছিলুম। সেই থেকে মাঝেমাঝেই, কলকাতায় দুপুরবেলা, হঠাৎ তার ডাক শুনি ! এখানে পাথর বিক্রি ভালোই হতো !

সুতরাং, আমার ছেঁড়াখোঁড়া পদ্য অর্থাৎ অংকটি শেষমেশ দাঁড়ালো।
তৈমুর ! তৈমুর !—পোস্টার ! পোস্টার !—পাথর ! পাথর !

হাতছানি, নীল হাতছানি দূর থেকে – আমলকি ফলের মতো স্বচ্ছ
নীল ভুশুণ্ডদের মাঠ, ইটকাঠ, খরস্রোতা বেজি
বাল্যকাল—তৈমুর !   তৈমুর !

এখন প্রহৃত আমি ভাঁটফুল, রাস্তার কুকুর—বিবেচনা ডাস্টবিনে
তালবীথি, সনাক্ত তালগাছ—বাজ পড়ে স্বস্থতা গিয়েছে
তবু স্বাধীনতাপ্রিয়, করকোষ্ঠীসমেত ধরেছি কামড়ে শুধু—
পোস্টার !   পোস্টার !

আবার নোঙর তুলে নিলে হয়—জলের বেদনা একা জল বুঝবে—
অসীম রোদন
নৌকায় অনেক কাল ভাসা হলো
এখন স্থগিত
ঘাটের সিঁড়ির মতো হয়ে যাবো—পাথর ! পাথর !

তুমি আছো—ভিতের উপরে আছে দেয়াল

আমার হাতের উপর ভারি হয়ে বসেছে প্রেত
ফুটপাতে শব্দ হয় ক্রমাগত
বৃষ্টির মুখ-ঝোঁকা মেঘ দূরে সরিয়ে দিলো হাওয়া
আমরা বিকেলবেলা চাঁদ দেখেছিলাম
তরমুজের লাল কাটা ফলার মতন ধরণী-সবুজ চাঁদ

পৃথিবীতে যতো কঠিন সমস্যা ছিলো সব চাঁদের নিচে জড়ো হয়ে
ততো কঠিন ছিলো না আর
চাঁদের মতন কোমল, পাংশু ছিলো জীবন আমাদের—জীবনাকাঙ্খা
পৃথিবীতে বদ্না-গাড়ু পরিস্কার ছিলো সোনার মতন
সোনার মতন মুসলমান নেমে গিয়েছিলো ওজু করতে
ওদের আল্লা করাতে খান্ খান্ হয়ে গিয়েছে কাল
তার কাশফুল উড়ছিলো হাওয়ায়—তাব কানের পৈতা হয়েছিলো
নির্ঘাং কুটি কুটি

কুশাসনে বসতে আমার ভালো লাগে না
ভালো লাগে না আমার ইন্দ্রজাল—মোহরের গল্প
আলিবাবা ভালো লাগে না আমার
ভালো লাগে না আমার সাধারণতন্ত্র—দেহ-বিক্রি
আমেরিকার কোনো কিছুই ভালো লাগে না আমার—
কেনেডির মৃত্যুই আমার ভালো লেগেছিল !

আকাশমণির মাথায় হাওয়া লাগছে
ফুল-বেলপাতা সমস্ত আমার হাত থেকে পড়ে গেলো
ডাকছে তক্ষক—শিবের ধিঙ্গি লিঙ্গ করছে খাঁ খাঁ
মাঠ ভেঙে রোদ্দুর এসে পড়ছে গায়ে তার
দেবতার সবই আছে—ছাতা নেই—নেই ওয়াটার-প্রুফ
বৃষ্টির বিরুদ্ধে, ঝোড়ো হাওয়ায়

দেবতাদের দেশে ইংরেজি নেই—হিন্দি নেই
নেই ভাষা কোনো
ইংগিতে ইংগিতে বাংলাদেশের মতন কথা আছে তার
আছে যোগাযোগ—আছে কলংকের কাল—
আছে চলাফেরা-

দেবতাদের দেশে ইংরেজি নেই—হিন্দি নেই
আছে লরির আওয়াজ, মুক্তি-যুদ্ধ
আছে গড়নির্ণয় দেয়াল-ঘড়ি

আছে সবই, যাকে তোমরা বলো ‘এ্যাসেট্’ !
মৃত্যুর অনেক আগে জন্মেছি আমরা—
জন্ম আগে—মৃত্যুর কাছে যেতে হলে পথ,
পথের পরে পথ ফেলে যেতে হবে আমাদের
সেখানে মাইল-পোষ্ট নেই—নেই টেলিগ্রাফ-তার
মৃত্যুর কাছে যেতে হলে পথ—
পথের পরে পথ ফেলে যেতে হবে আমাদের

তুমি আছো—ভিতের উপরে আছে দেয়াল
আছে কুলুঙ্গি, দেয়ালগিরি
আছে আসবাব উপঢৌকন মেহগনি-খাট পাশবালিশ
আছে পিকদানি পানের বরজ কাবুলি কলাগাছ
আছে ঘেটো রুই হাতছানি শ্যাওলা দাম
আছে প্রকৃত পিছিয়ে-যাওয়া শিশু ভোলানাথ শ্মশানের ছাই

তুমি না দিলে, আমার নয় কিছুই
কেননা তোমায় আমি বিবাহ করেছি—
তোমার খেয়েছি লালা, কেটেছি পকেট—বগলের খাঁজে
উপুড় ক'রে দিয়েছি পাউডার-কৌটো
তোমাকে ভালোবেসেছি ভালোবেসেছি

যেমন ক'রে কুকুর ভালোবাসে যেমন ক'রে মশারির গর্তে-গর্তে মশা
বসে যায় মৌমাছির মতন মাংসাশী
পৃথিবীতে বাঁচার কোনো প্রয়োজন ছিলো না—
বৈতরণী পার হয়ে তারাপীঠ যেতে হয়
আমাদের এঞ্জিন আমাদের লাল হলুদে-মেশা বগিগুলো ফেলে
গিয়েছিলো পথেই !

শান্তিতে কিছুদিন বিদেশে থাকা চলে—দেশের অদ্ভুত
গোলযোগ বিড়ম্বনা ভালো লাগে আমাদের চিরদিনই
গাধা ভালো লাগে, ভালো লাগে র‍্যাদার উপর কাঠ-বরফের কুঁচি
পরিত্রাণহীন খাটা-পায়খানা ভালো লাগে আমাদেরও—
আমাদের দেশের যা কিছু আছে—পেঁপে গাছ
ভালো লাগে আমাদের—আমরা সুখী !

□

'তুমি আছো—ভিতের উপরে আছে দেয়াল' অক্ষর কটির পিছনে যেন এমন অর্ধসত্য রাখা যেখানে ভিত-হারা দেয়ালেব স্থাপনও সম্ভব ! পদ্যটির কাটা-ছেঁড়া শরীর-ব্যাপী তিতিবিরক্ত ভাব আছে, তা লেখকের তৎকালীন মানসিক অবস্থার পরিচায়ক। অহোরাত্র বহ্নিসেবনের পর সকালে কাঁপা আঙুলে ততোধিক দাড়িকমাবিহীন একটানা চলচ্ছবি—অর্থ অনর্থের মাঝামাঝি। ধর্ম-মূলক দাঙ্গার প্রতি ঘৃণাও আছে। ইতস্তত গ্রামের ইতস্তত ছবি, লেখকের বাল্যস্মৃতি চব্বিশ পরগণার দ্বাদশ দেউল, চন্দনবিল, বামুন-পুকুর, মুসলমান পাড়া, রেলইস্টিশন, মৌচাক প্রভৃতির—সর্বোপরি, অতীত আব অস্তিত্বের মুহুর্মুহু গোলযোগ আর কোলাহলের উপর দাঁড়িয়ে আছে এক বিহ্বল আর অর্ধসচেতন মূর্তি—যা তোমার, নারীরই চিরন্তন অভিপ্রায়-মাখা !

জানেন ও কে ?

পাহাড়তলির বাড়ির নিচের টালিখোলায়
জল পড়েছে
জল পড়েছে ? নাকি শুধুই তুষার প্রপাত ?
আকাশ জুড়ে উল্টে দিয়ে কালির বাটি
হাওয়ায় ওলোটপালোট করে ছাতার কাঠি
কে চলেছে ছাতার নিচে মুখটি ঢেকে
—জানেন ও কে ? জানেন ও কে ? জানেন ও কে ?

□

শীতের বৃষ্টি, দারজিলিং-এর ঘর থেকে দেখা। পায়ের কাছে
চুল্লি দাউ দাউ। গাঁয়ে ভেড়ার চামড়ার
মতন আউঝাউ লোম। কনকনে বাতাস বইছে বাইরে। বাতাস,
না ঝড়। তার মধ্যে জানালা দিয়ে ছাতা মাথায় যাচ্ছে কে ?
এ সময়টা কেউ পথে বের হয় না। ও বেরিয়েছে। ও কে ?
আমার পার্শ্ববর্তিনী ওকে চিনেছে। কিংবা, চেনেনি, মনে হয়েছে
ও চেনেই, না হলে অমন ক'রে তাকিয়ে আছে কেন ?
তাই অকস্মাৎ ঝনঝন ক'রে ওঠে তিনসত্যির মতো তিনভাবে এক
জিজ্ঞাসা—
'জানেন ও কে ? জানেন ও কে ? জানেন ও কে ? '
শুধু একটি ছবি। ছবির পর ছবি গড়ার পরিকল্পনা ছিলো, মনে মনে।
এবং রহস্য গঠন। তার বদলে হঠাৎ ছেদ টেনে দিয়ে মনে
হলো, এর পরে আর কিছুর দরকার নেই। তিনভাবে একটি
জিজ্ঞাসা ভুলে ধরার পর, উত্তর না পেলে স্তব্ধ থাকাই
দরকার। শব্দের স্তব্ধতা স্বীকার করা দরকার।

আমাদের সম্পর্ক

ঈশ্বর থাকেন জলে
তাঁর জন্য বাগানে পুকুর
আমাকে একদিন কাটতে হবে।
আমি একা···
ঈশ্বর থাকুন কাছে, এই চাই—জলেই থাকুন!

জলের শান্তিটি তাঁর চাই, আমি, এমনই বুঝেছি
কাছাকাছি থাকলে শুনি মানুষের সঙ্গে দীর্ঘদিন
সম্পর্ক রাখাই দায়
তিনি তো মানুষ নন!
তাছাড়াও, দূরের বাগানে
—থাকলে, শূন্য দূরত্বও
আমাদের সম্পর্ক বাঁচাবে ॥

□

'ঈশ্বর থাকেন জলে'—স্থলে নয়, অন্তরীক্ষে নয়—এই বাক্যবন্ধটি পাবার পর হুর রে চিৎকার ক'রে উঠেছিলাম, মনে মনে। মেজাজে বেশ টানটান ভাব বোধ করেছিলাম। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, তৎক্ষণাৎ ভাবি, এই যে আমি জানতে পেরে গেলাম, সেকারণেই তাঁকে আমার কাছাকাছি আনার একটি চেষ্টা দিতে হয়। এবং পরক্ষণেই, তাঁর জন্যে বাগানে পুকুর কাটার পরিকল্পনা।

আমি স্থলের লোক। জলস্থল পাশাপাশি এবং স্থল জলকে বন্ধনে রাখে। বন্ধন এখানে বাহুবন্ধনের মতন। আমার বাহুবন্ধনে ঈশ্বর—এই আলেখ্য আমাকে রোমাঞ্চিত করে।

তবু মাঝে মাঝে তাঁকে স্থলে আশা করি। স্থলের অন্য নাম
প্রকাশ্য। অন্তরাল নয়। অন্তরাল থেকে আলোয় তিনি
আসবেন, মাঝেমধ্যে। সবসময় নয়।
জলে শান্তি। শান্তি স্থলে নেই—
এই বিবেচনা আমার বেশ কিছুদিন যাবত।
আমি পাহাড় জঙ্গলের চেয়ে সমুদ্রতীরে যেতে ভালোবাসি।
খুব উচ্ছন্ন বোধ করলে আমি নদী সমুদ্রের কাছাকাছি দৌড়ই।
শান্তি পাই।
আবার স্থলে অর্থাৎ শহরে এসে তছনছ।

পিছনে চলেছে, থাকে দূর

পিছনে চলেছে সে-ও, ভদ্রতাসম্মত দূর থেকে
আমাকে রেখেছে চোখে ; ভিড়ে ঢুকে দিতে চাই ধোঁকা
সহজে হজম করে যেন অন্যমনস্ক ও বোকা
কিছুটা সে, যথাসাধ্য ; আর করে নিজেকে আলাদা ।

পিছনে চলেছে সে-ও, আমি চুপকি দিই, সরে পড়ি
ভাঙা দেয়ালের পাশে শ্যাওলা মেখে যখন স্থগিত
অকস্মাৎ চেয়ে দেখি দেয়ালের অর্ধখান ধরি
সে আছে দাঁড়িয়ে, তার উপস্থিতি সম্ভ্রমজড়িত ।

ভাবলেশহীন দৃষ্টি মেলে রাখে আমার উপরে
অথচ, প্রকৃতপক্ষে, দেখা তার হয়তো ঊর্ধ্বের
পাখি কোনো ; আকাশে মেঘের গতি, কিংবা বুনিয়াদি-
ইস্কুলের টালিখোলা , যখন বৃষ্টির জল পড়ে
আমারই ছাতার নিচে আসে সে অক্লেশে, শামুকের
মতন নিমগ্নপ্রাণ ; কাছে পাই তবু থাকে দূর ॥

□

এ কোনো নারীর কথা নয়—আবছায়ায় দাঁড়ানো কোনো
পশ্চাদ্ধাবক, যে আমার পিছনে পিছনে চলেছে। আমি
তার নিঃশ্বাস পিঠে অনুভব করছি। ঘুরে দাঁড়াতে পারছি না।
তার মুখোমুখি হতে যেমন আমার ভয় বা ভদ্র বাধা, তারও বুঝি
তেমনি। সে দ্রুত হাঁটছে না। আমি তাকে এড়াবার জন্যে গলি
উপগলি ধরলেও, সে আছে। পিছনে আছে।
কিন্তু, বৃষ্টি তাকে আমার ছাতার নিচে টেনে আনে।
পাশাপাশি আনে। একত্র করে।
কাছে থেকেও, দূরে থাকে সে।

আমার একটা সময় এই ধরণের অসুখ করেছিল। রাস্তায় বেরুলে,
বিশেষ ক'রে, আমার মনে হতো, কেউ আমার পিছু নিয়েছে।
কেন নিয়েছে, শুধোবার সাহস ছিলো না।
টের পেয়েছিলাম, বহুদিন পর, ও আমারই এক টুকরো, যে বিবেচক,
যে আমার নিত্যসঙ্গী, যে খুব কাছে থেকেও বহুদূরে স্থাপিত।

শুনেছিলাম, সঙ্গে আছেন

তোমার কাছে শুনেছিলাম, সঙ্গে আছেন তিনি
তাইতো হিসাব রাখি না আর আমার বিকিকিনির
লাভ হলো, না হলো ক্ষতির
পরিমাণ তো সেই প্রগতির
একটি মুখোশ, অন্যটি মেষ
তাদের একটি শুভারম্ভ, অপরটি শেষ।

তোমার কাছে শুনেছিলাম, সঙ্গে আছেন তিনি
তাইতো কোনো পাই না হিসাব আমার বিকিকিনির
এখন কিছু ভিক্ষা পাবো ?
যে পথ তোমার এবং তোমার, সে-পথখানি মাড়িয়ে যাবো ?
সঙ্গে-থাকার কোথায় তিনি ?
তোমায় আমি ঠিক চিনেছি, তাইতো তাকে অল্প চিনি !

□

'এখন কিছু ভিক্ষা পাবো ?
যে-পথ তোমার এবং তোমার, সে-পথখানি মাড়িয়ে যাবো ?'
—এই ভিক্ষার কথাটা বহু পদ্যে ঘুরে-ফিরে এসেছে। গ্রামের এক আত্মীয়বাড়িতে অন্নপূর্ণা পূজা হতো। সেই হলুদবরণ প্রতিমা ছেলেবেলার, তার দুটি হাতে ভিক্ষাপাত্র। চাইতে গেলে এভাবেই চাওয়ার সেই স্থিরছবি আমার স্মরণে জ্বলজ্বল করে।

তোমার কাছে শুনেছিলাম, আমি না, তিনিই সঙ্গে আছেন। তাঁকে ঠিক চিনি না। তোমায় চিনি এবং তোমায় চিনি বলেই তাঁকেও কিছু চিনি—এই দাবি।

এই তিমি ঈশ্বর নন। এই তিনি রমণীর আপনজন। তাঁর প্রতি তাচ্ছিল্যবশত এই 'তিনি' সর্বনাম।

নিজস্ব অন্তরে

জলের ভিতর একটি দুটি ঝিনুক এসে নাচে
একটি দুটি ফুল ফুটেছে বনের সকল গাছে।
মন ভালো নেই, বন ভালো নেই, ঝর্ণা ছিলো ফাঁকা
কোথাও কিছু ভুল হয়েছে আমার মনে রাখায়।
তাই পৃথিবী যথেষ্ট নয়, যৎসামান্য দিয়ে
আমার চোখের সম্মুখে যায় তক্ষুণি হারিয়ে--
অনেকগুলি পথ রয়েছে, একটি সবার জানা
সেই সকলের পথটি ধরে আমার যেতে মানা !
বারণ কেন করে ?
মন ভালো নেই, বন ভালো নেই, নিজস্ব অন্তরে।

□

অন্তরে মন যেমন, বনও তেমন আছে। সারল্য জটিলতা রহস্য সব। ঝিনুকের নাচ দিয়ে যার শুরু, সেই উলটোপালটা তামাশা শুনিয়ে নিজেকে বুঝা দেওয়া। নয়তো বনের সকল গাছে মাত্র একটি দুটি ফুল সম্ভব নয়। বোঝা যায়, নিজের ভালো না থাকাটাও বনের গাছের ওপর শোধ নেওয়ায় কিছুটা কমছে। ঝর্ণাকেও শূন্য ক'রে দিয়ে নিজেকে তার সমান করা

এবং পথ অনেক, একটি পথই সবার জানা—সেখানে ভিড়, কোলাহল। সে-পথে যেতেও আমার নিষেধ। সে-নিষেধ নিজেই নিজেকে। বারণও নিজের। কেননা, সে-পথ সুখের।

দূরে ঐ যে বাড়িটা

দূরে, ঐ যে বাড়িটা দেখছো
একসময় ওখানে বহুদিন ছিলুম, ছোটো
মশারির ভেতরে ছোটো ছোটো হাত-পা
সুখ, দুঃখ ব্যথাবেদনার বাইরে, ঐ
আপন মশারির ভেতর—দূরে ঐ যে বাড়িটা দেখছো
একসময় ওখানে বহুদিন ছিলুম !

আজ এখানে আছি ।

সুখদুঃখ ব্যথাবেদনার ভেতর
কিন্তু আমার মশারির বাইরে—
খারাপ নেই । তখনো ঠিক যেমনটি ছিলুম
আজো তেমন ।
গা-গত্তি-ভর শ্যাওলা, ছোটো
হাত-পা বড়ো কিন্তু কাঁকালসার ।
যাবার আগে বোঝা হাল্‌কা রাখাই রীতি
নইলে যে বাহকদেরই কষ্ট ।

□

একসময়, বেশ কয়েক বছর উল্টোডাঙ্গার এক ঘরে । টিনের চাল ন্যাংটো ইটের বাড়ি । দূর থেকে দেখলেই মশারির চেহারা । মশারির ভিতরেই শিশুর ঘুম, হাত পা নাড়া ।

এই বাড়িটা আমার মতন বড়ো একটি শিশুর মশারি : হাত পা-র
অসহায় নড়াচড়া। যেমন আমার। কাজকর্ম নেই,
ইচ্ছেও নেই করার।
মনে পড়লো, আমি দূর থেকে বাড়িটাকে দেখছি। ফলত
মশারির বাইরে আমি। বাইরেটাও খারাপ নয়। শিশুর
আবোলতাবোল হাঁটায় বেশতো দিন গড়িয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে
জড়িয়ে আছে, পাথরের মতো স্থির কিছু, যার গায়ে শ্যাওলা।
স্থিরতার, অচলতার শ্যাওলা। তবু, যেতে হয়। ক্ষয় অমোঘ।
যাবার সময়, বাহক বা মানুষের প্রতি দৃষ্টি। কষ্ট, শরীরের, না।
দেবারই ইচ্ছে করে।

নষ্ট মানুষ

কাঠের হলুদ ছাল, তবু যেন রেণুতে আপ্লুত
শীতে ম্লান ওষ্ঠ তোর, পরবাসী শাসনে মধুর
আধশোয়া জানালায়— এ-আলেখ্য করে উপদ্রুত
নিঃসঙ্গ প্রকোষ্ঠ মোর, যদিও সন্নিধি হতে দূর
আর ছিলো পদতল, স্মৃতি তারই করোষ্ণ স্থপতি
আরোগ্যের আশাহীন এ কী রোগ ধরেছে কাতরে
হৃদয়ে মেধায় ঝড়, কিন্তু সে নিশ্চিন্ত অধোগতি
স্বর্গের উজ্জ্বল শান্তি ঝাঁপ দিলো অজস্র পাথরে।
কে দোষী ? বিচার করো, অকারণ জড়তামুখীনা
যে তুমি চঞ্চল ছিলে অনাহত পতঙ্গের মতো
অলোকরহস্যে চুর, কাছে তার নিষ্প্রভ নবীনা
সহসা কীভাবে হ'লে এতোখানি ব্যথায় সন্নত
বরং আমারই দোষ· · · এই বৃষ্টি, মুখাপেক্ষী হাওয়া
আমাকে করেছে নষ্ট মানুষের করতলগত

□

লেখাটির শুরু স্মৃতিতে। একটা সময়ে লেখার খাতার উপরে কিছু কিছু পরিচিত নাম লিখে ফেলতাম। প্রায় অকারণেই। তারপর সেই নামের চতুর্দিক খুঁড়ে কখনো কোনো পদ্যের প্রথম নেমে আসতো। আমি চোখ বুজে সেই তামাম পরিপ্রেক্ষিত চোখে বুকে ভাসিয়ে তুলতাম।

তেমনি কিছু পুরনো হলুদ কাগজ হাতে, হঠাৎ আমার—পদ্যের শুরু। কাঠের হলুদ ছালের উপর 'হলুদ' রেণু পড়েছে। রমণীর টুকরোটাকরা ছবি। আলস্যভরা, প্রভাময়। স্বপ্নের উজ্জ্বল শান্তি ইত্যাদি পংক্তি বয়ে যে ছবি, তা জলপ্রপাতের। পুরুষের প্রেম—এভাবেই রমণীর প্রতি ধেয়ে আসে। কখনো তার প্রতি মায়া ও করুণা। নিজেকে নষ্ট মানুষের করতলে সঁপে দিয়ে বা নষ্ট করেও একধরণের আত্মসুখ।

ঐ গাছ

একটি নিষ্পাপ গাছ আমাদের মাটিতে বসেছে
বাস্তুর নিকটে আছে, বুকভরা মায়ার নিকটে
পিতৃপুরুষের স্নিগ্ধ স্মৃতির মতন কেশপাশ
এলিয়ে রয়েছে ছায়া, সীমাহীন রোদের ভিতরে –
যেন ঠাণ্ডা প্রেম তার কুয়োতলা নিয়ে আছে কাছে
মানুষের মুখশ্রীর অগোছালো শান্তি ও অগ্নির
পারম্পর্য মেনে নিয়ে, মেনে নিয়ে প্রকৃত চিন্ময়
রূপ তার, ঐ গাছ আমাদেরই মাটিতে বসেছে।

□

প্রকৃতপক্ষে, ঐ গাছ মনেরই মাটিতে। সে গাছ গাছের মতন নয়, রমণীর মতন। রোদ্দুরকে, বস্তুত, প্রেম ভেবে নিয়েও, ছায়াকে প্রেম হিসাবে ধরা হচ্ছে। কুয়োতলা—শান্তির কূপ, আমার লেখার মধ্যে মাঝেমধ্যেই। শান্তি আর আগুন, আমার বিশ্বাস, সহোদর হয়েই আছে। এক অপরের না হলে চলে না।
কিংবা গাছ কোনো দুজনের স্বপ্নের সৌহার্দ্যের শিশু হিসাবে দাঁড়ায় নি কি ?
ঠিক যে কী বলতে চাওয়া—তা পরিষ্কার হতে পারেনি তেমনভাবে।

কাগজের নৌকা

এ-বয়সে একবার দুঃখের ভিতরে গিয়ে
দাঁড়াবার ইচ্ছা হয় মনে
কথা তারও কিছু আছে—আমাকে গোপনে
জানাবার, ভুলে গেছি পথে হেঁটে, বিছনায় ঘুমিয়ে
কথা তার ছিলো কিছু, বলেছিলো একদিন যখন
আমার শরীরে-মনে ছিটেফোঁটা কাপাস ছিলো না।
এখনো কিছুই নেই, গায়ে তাই লাগে না বৃষ্টির
আদর, রোদ্দুর, রাগ ; ছায়া এসে ছোয় না সন্দেহে
এ-মূর্তি মানুষ নাকি ? মায়া নাকি ? মতিভ্রম নাকি

নিজেরও সন্দেহ হয়—মৌন হিম জলের ভিতরে
আসমুদ্রহিমাচল দেখেও সন্দেহ জাগে ঘোর
হয়তো মানুষ নয়, অন্য কিছু, অন্যতম কিছু··
দুঃখের অগ্নির মধ্যে কাগজের নৌকা ভেসে যায়।

□

'দুঃখের অগ্নির মধ্যে কাগজের নৌকা' ছবিটি ঠিক নিজের নয়। শুনতে পাওয়া। ভেসে যাবার ব্যাপারটা আমার নিজের সংযোজন। ভাসার কথা তো নয়। পুড়ে যাবার, ধ্বংস হয়ে যাবারই কথা। কিন্তু, হয় না। হয়নি।

দুঃখের ভিতরে সর্বদা থেকেও মনে হয়, যেমন মনে হয়, জীবনে বহুবার দেবদারুবীথির মধ্যে হেঁটেও, একদিন হঠাৎ নতুন সে-পথে হাঁটতে উপস্থিত। পথ নতুন নয়। এরকম ভুল হয়। হতে পারে। দুঃখ সেই জন্ম থেকে ছুঁয়ে আছে, দেহ যখন কামনাহীন—সেই তখন থেকে। তাই গায়ে লাগে না। বৃষ্টি, আদর, রাগ, রোদ্দুর, কিছুই যার গায়ে লাগে না ; তাহলে সে কি মানুষ ?

দুঃখ আমার

দুঃখ কিছু গোপন এবং দুঃখ কিছু কাছের
হয়তো আমার মধ্যেও তার বসার জায়গা আছে
দুঃখ কিছু পাথর এবং দুঃখ থাকে কাদায়
দুঃখ আছে বাইরে এবং ঘরদুয়ারে বাঁধা
দুঃখ কিছু জমির বুকের শস্য-খোয়া নাড়ায়
দুঃখ, আমার সুখের ঘরে পারিস তো হাত বাড়া।

□

ছড়ার মতো ঢঙে দুঃখকে নিয়ে এতোলবেতোল শামলাশেতোল খেলছি যেন! তাকে বসতে পিঁড়ি দেবার মতন সচ্ছন্দে আলাপ করা। কোথায় আছে, কোথায় নেই। কাছের বলেই আমার মধ্যে বসার জায়গা দিতেই হচ্ছে। দুঃখ কোথায় নেই। সহজ ভাবে আছে। নিঃশ্বাস হয়ে আছে। তবু, যেখানে তাকে যেতে দিতে চাচ্ছি না, তা আমার স্বপ্নের সুখের ঘর। স্বপ্নের মধ্যে দুঃখ সহজে আসে না। আসতে চায় না। বিশেষ ক'রে, তাকে এতো খোশামোদ করার পর।

এভাবে হয়

এভাবে নয়, এভাবে ঠিক হয় না
নদীর বুকে বৃষ্টি পড়ে, পাহাড় তাকে সয় না
এভাবে নয়, এভাবে ঠিক হয় না।

কীভাবে হয়? কেমন ক'রে হয়?
যেমন ক'রে ফুলের কাছে রয়
গন্ধ আর বাতাস দুইজনে

এভাবে হয়, এমনভাবে হয়।

□

এই হওয়ার ব্যাপারটা, সত্যিই, কোনো হওয়া কিনা, জানি না।

লিখে ফেলে প্রথম পংক্তি থেকে, নিজের দিকে তাকিয়ে এই উপলব্ধি।

নদী বৃষ্টি সয়। পাহাড় সয় না বলেই নদীতে পাঠায়। বৃষ্টি নদীর আপন। পাহাড়ের নয়। বৃষ্টি নদীর প্রেম ভালোবাসা। পাহাড়ের নয়।

তাই যেভাবে হওয়া উচিত, আমার সেভাবে হচ্ছে না। কীভাবে হয়? জানা নেই। কাকে 'হয়' বলে জানা আছে। অভিজ্ঞতার সায় আছে।

অন্ধকারে

অন্ধকারে হাতে আসে হাত—
কে কাকে ডেকেছে অকস্মাৎ
কে সে ?   কথা বলো, কথা বলো

শব্দ নেই, শব্দ নেই কোনো
শব্দ নেই, শব্দ নেই কোনো

□

বিশেষ একটি ঘটনা পিছনে। মনে পড়ছে। কিন্তু সে ঘটনা, এমন
কিছু নয়। সর্বদাই ঘটে। অর্থাৎ, ঘটতে পারে। সেই সামান্য
আমাকে তাড়া দিয়ে গুটি তিনেক সাধারণ কথা
লিখিয়ে নিয়েছে।
বিশেষ একটি পল্লীর অন্ধকার বারান্দা। সবার ঘরে মানুষ। প্রায়
সবার দরজা বন্ধ। আমি সিঁড়িতে বসে, একমনে পানীয় ঢালা-
উপুড় করছি। কতক্ষণ পরে, আজ মনে নেই, বারান্দায় তার হাতে
আমার হাত পড়েছে বাঁধা। সে আমাকে চায়। ঘটনাটি খুব
আন্তরিক —তার চাওয়া।
অপ্রস্তুত আমি ভয় পেয়ে পিছিয়ে
গেলেও, সে হাত ছাড়েনি। নিচে কাদের গলার আওয়াজ।
নিচে, না আমার ভিতরেই ? কে যেন কাকে ডাকছে। কে
ডাকছে, আমি শুনতে পাচ্ছি। কে সে ? উত্তর নেই। অন্ধকার
বারান্দায় ঐ টানাপোড়েন। ঐ হতভম্ব ছবি। ছবিতে কোনো
কথা নেই। কথা কে বলবে ?

হারাতে হারাতে তাকে

আমার শিকড় নেই, ডালপালা নেই পাতা নেই
মাংসে ঘোর দুঃখ আর হাড়ে আছে বাতাস বহতা
আমার বাগান নেই, মাটি নেই, মাতৃভূমি নেই
আমার স্বপ্নের মধ্যে ওড়ে শুধু ধুলো ও পাথর।

এই আমি, পৃথিবীর মানুষের মধ্যে একজনই
যার সব ছিলো, যার সব গেছে—অকস্মাৎ নয়
ধীরে ধীরে গেছে, গেছে থেমে-থেমে, একটি—একটি ক'রে।

তা নিয়ে প্রকৃত কিছু বলার দরকার যেন নেই
তা নিয়ে কারুকে কিছু বলার দরকারও যেন নেই
অভিযোগ নেই, আছে হারাতে-হারাতে তাকে পাওয়া!

□

মানুষকে গাছ হিসেবে দেখা আমার প্রিয় বাসন। বিশেষত নিজেকে। আমার স্বভাবটা তাই। যেখানে যাই শিকড় নেই। ডালপালা বের হয়। লতাপাতা বাতাসে! সেরকম গাছের, ক্ষোভে মনে করা হচ্ছে, গাছত্ব নেই। গাছের আকাশ পাতাল স্বপ্নের বদলে, এখন শুধু ধুলো আর পাথর। তাও অস্থির।

হিজলী থেকে চিত্রাপাথর বলে একটি ছবির গ্রামে গিয়েছিলাম কজন মিলে । বিকেল নাগাদ শালজঙ্গলের দিকে মন-মন কাজে গেছি। ভুরুর মতন টানা নীল রেখা জঙ্গলের ওপার থেকে বরার মতন ফুঁড়ে একখণ্ড বাতাস। তারপরই হঠাৎ আঁধি। আমরা খরগোশের মতন খোয়াই মতো জায়গাটায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লাম।

সে তৎপরতা দেখার মতো। ঝড়ের সঙ্গে মরাম উড়ছে। এই মিনিট দুই, মাথার ওপর দিয়ে কী একটা দুর্দান্ত ঘটনা ঘটে গেলো। উঠলুম। ওঠার অবস্থা নেই। মরাম পাথরগুলো পিঠ চেপে জ্যান্ত সমাধির ব্যবস্থা করছিলো প্রায়। স্বপ্নের মধ্যে ছাড়া কী ?

পরের অংশে 'কারুকে' শব্দটিই দরকার। এর প্রতি অভিমানবশত লেখা হয়, অভিযোগ নেই—এইসব। অর্থ সরল, বাঁকাচোরা কিছু নেই।

কে যায় এবং কে কে

গাছগুলো আর পাথর এবং পাথরভরা কামিন
বনের মধ্যে আমি তখন মনের মধ্যে আমি
মনের মধ্যে কে যে
মনের মধ্যে বিবাদ করে স্বপ্ন দেখায় যে যে
বনের ভিতর কে যায়
মনের ভিতর বৃষ্টি আমার বর্ষাতিটা ভেজায়
কে যায় এবং কে কে
এক ভাঙা ইট থাকলো পড়ে—হায়রে, আমার থেকে।

□

পাথর শরীরে ভরা না, রক্তে, কাঠিন্যে ওরা পাথরেরই মতন।
গোটা লেখাতেই অন্যের যাবার কথা—মন ছেড়ে, বন ছেড়ে।
আমি বাদ।
আমি বনের ভিতর নিশ্চিত। সেই আমার মনের
কথা এক ফাঁকে উঠেছে। বৃষ্টি পড়ছে। সেখানে আবার আমার
বর্ষাতির জন্যে জায়গা চাই। যেন প্রাসাদ আমি, ইট আমি,
সংগঠিত আমি। দুটো টুকরো হতেই হয় শেষপর্যন্ত। একটা
যায়, অন্যটা থাকে।
'হায়রে' দুঃখবাচক ধ্বনি না কোনো, ফালতু।
দেখন-দুঃখ। বলতে হয় বলেই বলা।

আর কিছু নয়

যদি আমার দুয়ার ভাঙে তোমার কথায়
তার ছিলো সেই প্রবণতা
এমন ক'রে ভাঙার ছিলো প্রবণতা
আর কিছু নয়।

যদি আমার হৃদয় ভাঙে তোমার কথায়
তার ছিলো সেই প্রবণতা
এমন ক'রে ভাঙার ছিলো প্রবণতা
আর কিছু নয়।

□

আর কিছু নয়! এই ভাঙাভাঙি তো সামান্যই।
দুয়ার থেকে পরের স্তবকে হৃদয়—
সর্বত্রই মিস্তিরির কড়া হাতের আওয়াজ উঠছে। মেয়েটিকে
মিস্তিরির পাশে দাঁড় করিয়ে বলা হচ্ছে,
ওর দোষ নেই, ওর প্রবণতা ছিলো। দোষ সেই প্রবণতার
পক্ষে 'তোমার' এবং 'তার' দুজন। তুমি বর্তমান।
সে দূরস্মৃতি, কিন্তু প্রধান।
তার কথাই আড়াল থেকে বলার জন্যে এই আয়োজন।
তুমি পরোক্ষ, এবং, তোমার
কথাতেই দুয়ার, হৃদয় উভয় ভাঙছে বলে জানা যাচ্ছে।

দরোজা

বন্ধ দরোজার বই ততোবেশি আধুনিক নয়
জটিল পদ্যর মতো মানুষের কোষ্ঠী ও প্রেক্ষিত
ওর মতো কেউ নয় ছোট বড়ো চিঠিপত্র আছে—
দাগ আছে, কাটা আছে এবং হলুদ হয়ে আছে
ওর মর্মতল, ওকে মিস্ত্রি এসে সময়ে রং করে।
কিন্তু, যে দেখার স্বাথে ওর দুঃখ সুখ ও সম্বিৎ,
ওর গায়ে চুনবালি, কড়া-কব্জা সমস্তই আছে
প্রসঙ্গে জড়িয়ে আছে মাকড়সার শুকনো দেহ, জাল,
খিল খিড়কি সবই আছে মানুষের গূঢ় স্মৃতি নিয়ে।

মানুষের মুখ, হাওয়া ওকে করে জোৎস্নায় প্লাবিত।
রুগ্ন ঘাস শুয়ে থাকে, বিছানার প্রান্তে বসে মাছি,
ভয়ংকর গোলা ভেঙে মেজেয় ছড়িয়ে পড়ে ধান—
মিলন বিরহ শ্লেষ্মা একটি ঘর ভর্তি ক'রে রাখে
ফুলের পরাগে, ক্লেদে, অসাফল্যে, ডুবন্ত জাহাজ
ঘরের সমুদ্রে করে ওঠানামা অন্ধকারে-রোদে ॥

□

দরোজা আর বই চেহারায় ভারি একরকম। দরোজা খুললে ঘর। বই মেলে ধরলে ঘরের মতন সম্ভাবনা। দুয়ের ক্ষেত্রে যাওয়ার, ঢুকে পড়ার একটা ব্যাপার আছে।

দরোজার গায়ে সবই। মানুষের সংসার এবং সভ্যতা এবং জীবনযাপনের প্রথমেই দরোজা। মানুষের মুখও দরোজার মতন। পদ্যটা যেসময়ে লিখেছি, সে সময়ে শরীর উড়ে-পুড়ে একসা

হাতের দিকে তাকাই—মনে পড়ে ইটচাপা ঘাসের কথা।
তেমন সাদা, তেমনই রক্তহীন। বিছানায়-বসা মাছি তাড়াবার
সাধ্য নেই, এমন অবসন্ন সে, অর্থাৎ আমি. অর্থাৎ সেই সময়ের
ইটে চাপা-পড়া জব্দ লোকটা।
নিজের দড়ি-বাঁধা ছবি দেখে লাফ দেয় লোকটা তৎক্ষণাৎ—তাই,
‘ভয়ংকর গোলা ভেঙে মেজেয় ধান’ ছড়িয়ে পড়ছে। ধানের চাপে,
হলুদের, পরাগের চাপে গোলা ভেঙে যাচ্ছে। ছবিটা দেখিনি
কখনো। সত্যি নয়। ধানের বংবর্ণের পাহাড় গোলার মধ্যে
শান্তভাবে থাকতে পারে না। দরোজা খুলে অকস্মাৎ
ছড়িয়ে পড়ার নামই ফেটে পড়া। অসাফলো ডুবন্ত জাহাজ।
মৃত নয়, অস্থির ও ছন্দোময়।

লোকটাও ঐরকম। অসুখের মধ্যে সুখে জ্বলে ওঠে হঠাৎ।

একদিন

মানুষের ভালোবাসা মানুষের কাছে ছিলো দামী
একদিন, সুস্পষ্ট গন্ধ ছিল তার সন্ন্যাসী গুহায়
অর্থাৎ হৃদয়ে ঘ্রাণ, মনঃপ্রাণ ভক্তের প্রণামী
নিতেও উৎসুক ছিল, চারিদিক আত্মহত্যাকামী
আজ, কেন ? কী কারণে ? জেনেও নিশ্চিন্ত সুবিধায়
মানুষ লুকিয়ে থাকে ঘাস হয়ে মনের গভীরে...
সাড়াহীন, শ্রুতিবন্ধ, প্রজড় জীবিতমাত্র প্রাণে
মানুষই ছুটেছে দেখি মৃত্যুর নিষ্ঠুর অনুষ্ঠানে
সারবন্ধ পোকা যেন বাদলের, তাড়িত বিষের
কিংবা তারো চেয়ে নীল, শোণপাংশু, মালিন্যের হীরে—
মানুষ ? মানুষই তাকে বলা যায়, অন্যকিছু নয়।
উৎকৃষ্ট বিশ্বাস নিয়ে জন্মে যদি শিশুর হৃদয়
এখনো আমার দেশে, তার কানে-কানে বলি আমি :
মানুষের ভালোবাসা মানুষেরই কাছে ছিলো দামী
একদিন !

□

মানুষের ভালোবাসার দাম নিয়ে কথা উঠেছিল একদিন। ভালোমন্দ নিয়ে কথা উঠেছিল। কর্তব্য অকর্তব্য নিয়ে। বাঁচা-মরা নিয়ে।
শহরে-বন্দরে হত্যা আত্মহত্যা গ্রামে-গ্রামান্তরে পৌঁছে গিয়েছিলো। চোরাগোপ্তা এই বিচারে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বাদলা পোকার মতো একদল কিশোর যুবকের ঝাঁপ, ব্যবস্থার মূল ধরে নাড়া দিয়েছিলো। দরকার অদরকারেব প্রশ্ন নয়। মানুষকে মানুষ বলে চিনতে কষ্ট হচ্ছিলো তখন। এক ঠাণ্ডা মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল। আদেশের অধিকার কার, তেমন স্পষ্ট ছিলো না। পুরনো মানুষ ভালোবাসতো, বাসতে পারতো বলেই দীর্ঘদিন শোনা গেছে। মানুষ জন্তু নয়।

সশস্ত্র ও অস্ত্রহীন

স্পষ্ট সিঁড়ি থেকে তার পতনের শব্দ শোনা গেলো –
কিন্তু সে পড়ে নি ; এক বাস্তবিক ভুবনডাঙার
সকল সৌন্দর্য ছারখার হলে অধঃপতনের
ক্রমাগত শব্দ এসে আমাদের কান ধরে টানে —
মনে হয়, মানুষের কাছাকাছি স্থির দুঃসময়
এসে গেছে, পরিত্রাণ কোনোদিকে শিকড় মেলে না
দেখিয়ে দেয় না গর্ত, আঁধারের কোণঠাসা খুলি —
যাতে কোনোমতে রাখা মানুষের অধীর মস্তিষ্ক।

মানুষ পিঁপড়ের চেয়ে আজ নিচু সমাজে বসেছে
প্রচ্ছন্ন সংসার আর অন্যদিকে কীর্তিনাশা ডাক
বিপ্লবের,
প্রতিটি গৃহস্থ উপভোগ করে নিহত, ঘাতকে—
করতে হয় তা না হলে আরো যে দুর্ভাগ্য অপেক্ষমাণ
দুয়ারে, সিঁড়ির নিচে, রাজপথে উজ্জ্বল দুপুরে
সশস্ত্র ও অস্ত্রহীন মানুষের সভায় নির্জন।

☐

মানুষের এই বদলে যাওয়া—হঠাৎ কীভাবে সম্ভব হলো ?
রাজপথের হত্যা গেরস্থলির কাজেকর্মে চিড় ধরাতে পারে না।
মানুষ যেন অন্ধ যন্ত্র। অনেকদিন রক্তপাত দ্যাখেনি বলে যেন
রক্তপাতে তার পরোক্ষ সমর্থন আছে। সিঁড়ির নিচে, দরজায়,
গলির মধ্যে দিনেদুপুরে রাজনীতি ন্যাংটো খাঁড়া নিয়ে বেরিয়ে
পড়েছে। বাধা দেবার নেই কেউ। নিজেকে নিয়ে পালাচ্ছে
সবাই। মানুষ পিঁপড়ের চেয়েও তাচ্ছিল্যভরা কিছু।
মনে হয়, এর চেয়ে বড়ো দুঃসময় আর নেই।

পরশুরাম

অন্ধকার আর একটু জমুক, ঘুমুক পাশাপাশি ঐ পাড়াগুলো।
আমরা পা টিপে-টিপে বের হবো তখনই
মুখের ওপর এঁটে নেবো মুখোশ
হাতে নেবো টাঙ্গি, যাতে রক্তের দাগ লেগে আছে
আমার নিজেরই রক্ত
প্রথম দিন ওকে আমার নিজের রক্ত খাইয়েছি
দিয়েছি রক্তের স্বাদ, করে তুলেছি হিংস্র সিংহ যেন

ওস্তাদ ওঁরাও ঠিক যেমন-যেমন বলেছিলো।
আমি ওকে তেমনি ধীরে-ধীরে ক'রে তুলছি জাগ্রত
বিষাক্ত, পোষমানা অথচ নির্ঘাৎ !

ওকে শীতে তেল মাখিয়ে স্নান করাচ্ছি রোজ
গা মুছে দিচ্ছি গামছায়
সিঁথিতে দিচ্ছি সিঁদুর পরিয়ে
শোয়াচ্ছি বুকের পাশে, যেন সহধর্মিণী···

তারপর পা টিপে-টিপে নেমে পড়ছি রাস্তায়
জমজমাট অন্ধকারে, অলিগলি, ঘর-বার সর্বত্র
একজনকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি যে-ক্ষত্রিয় হয়ে
আমাকে তার ঘোর শত্রু করে তুলেছে।

□

আমাদের মধ্যে শরীরে মনে একজন ক্ষত্রিয় আর একজন ব্রাহ্মণের বসবাস। চিরদিন! দুজন একসঙ্গে জেগে নেই। দিনরাতের মতো। এক জাগলে, অন্য ঘুমায়। এবং কখনো এই দুজনের জেগে থাকা আবশ্যক হয়ে পড়ে—শিল্পের জন্যে, সমাজের জন্যে দুজনের আবহমান যুদ্ধবিগ্রহ।

নিজের ভিতরের সেই অংশ, যে বিচার চায়—সে জেগে ঘুমোলে, তার ঘুম ভাঙানো জরুরী হয়ে পড়ে। পৃথিবীতে কখনো-সখনো শান্তির বিঘ্ন ঘটাতেই হয়। আপদ নিশ্চিহ্ন করতে হয়। পরশুরাম সেই কাজে নেমে আসে। মানুষও নামে। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বিচারের নিজস্ব খাঁড়া হাতে নিয়ে।

আমরা এমন ঘটনা দেখেছি। ভবিষ্যতেও দেখতে হবে। অস্ত্রকে জীবিত করতে হলে তাকে রক্তের স্বদা, প্রয়োজনে নিজের, দিতে হবে। নতুবা সে ঘুমন্ত, মৃত, চলচ্ছক্তিহীন। দক্ষিণ হাতের কুঠার বাম হাত কাটে। স্বাস্থ্য রাখতে গেলে এমন কাটাছেঁড়া অনিবার্য।

মানুষের মধ্যে থেকে

মানুষের মধ্যে থেকে, মানুষের মধ্যে থেকে নয়—
আমি দুভাবেই তাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন
জানিয়ে এসেছি—এই এতোদিন, সম্পদে-বিপদে।
আজ কোনোভাবে তাকে সমর্থনযোগ্য মনে হয়
তোমাদের কাছে ? তার খেল ধূলা, গূঢ় আচরণ !
এর চেয়ে বনবাস ঢের ভালো—হিংস্রে আছে নীতি।
এখানে মানুষে শুধু মুখে বলে : নিশ্চিত সম্প্রীতি
আছে, আর আছে ব'লে মাঝেমধ্যে তুমুল বৈঠক
বসে দলমতধর্মনির্বিশেষ মানুষে মানুষে···
কুকুরও কীর্তন গায়, ঠেকা দেয় বৈরিগী বিড়াল !

□

মানুষকে এখন আর সমর্থন করা যায় না। বনবাস অনেক ভালো। জন্তুর হিংস্রতায় একধরণের নীতি আছে। মানুষের হিংস্র হওয়ার পিছনে কোনো নীতিই যেন নেই। হিংস্র হতে হবে বলেই হিংস্র। কলকাতার সেদিনের রাজনীতির মধ্যে মানুষের দামহীন অসহায়তার ছবি।

হৃদয়, স্মৃতি, স্বদেশ

মড়া পোড়ার গন্ধ নাকে আসছে
হাওয়ার আগুপিছু যাওয়াও বন্ধ
মালার ছেঁড়া ফুল নদীতে ভাসছে
না বুঝে ভালোবাসার সুখে অন্ধ
প্রবাসী পরবাসিনী ভালোবাসছে
হৃদয়, স্মৃতি, স্বদেশ, বনগন্ধ ।

ভুলের বোঝা করছে জড়ো, তুচ্ছ
কাপড় কানি সোনা রূপার সঙ্গে
আগলখোলা ঘরের কাঁথা কুচ্ছ
রাজহাঁসের গরব ভুরুভঙ্গি
এমন ক'রে মানুষ ভালোবাসছে
যেমন বাসে বনের পশুপক্ষী ।

□

মড়ার পোড়ার গন্ধে বাতাসও চুপ ক'রে দাঁড়ায় যেন, ঐ মৃতের মতো। মৃত্যু, তার গন্ধ চতুর্দিক থামায়। গঙ্গার জলে ছেঁড়া গাঁদাফুলের মালা দেখলে মড়ার কথা মনে পড়ে। বুকে ভালোবাসা যায় না। হিসাবে কোনো ভালোবাসা নেই। সেই ভালোবাসার থেকে প্রবাসী এবং পরবাসিনীর মুখ। পরবাস সবকিছু মিলিয়েই ভালোবাসে।

ভালোবাসার ভুল কাঁথাকান্তির সঙ্গে সোনারূপো বেঁধে নিচ্ছে। বিদায় এখন। সেই বিদায় বেলায় বিষণ্ণতায় তার রাজহাঁসের গ্রীবা। হাঁসের উপস্থিতি থেকে পশুপাখি আর মানুষের সমান ভালোবাসা। ব্যাপারটা ভালো নয়। পশুপাখির ভালোবাসাবাসীকে স্থির ও সচেতন বলে না কেউ।

সেই দুটি হাত ছোটে

মনুমেনটের নিচে, অন্ধকারে ক্রুদ্ধ বাংলাভাষা···
হিংস্র দুটি হাত ঘোরে মানুষের কণ্ঠ পাবে ব'লে
অন্ধকারে, হিংসাদ্বেষ হত্যাপরায়ণ সেই হাত
একদিন ছিলো ছোটো, একদিন সংশ্লিষ্ট মায়ের
বুকের ওপর থাকতো, আকুল মুখের ফুটো, বোঁটা
প্রাণপণ টেনে ধরতো···সেই মুখে হিংসা স্রোতোস্বান
সেই দুটি হাত ছোটে সহোদর কণ্ঠের উদ্দেশে
অন্ধকারে, দুপুর রোদ্দুরে···
কেন অন্ধ নয় জনক জননী ?

কেন নয় বধির, জরদগব, লুলা কিংবা পাথর নেশায়
মহাত্মা ও মতিচ্ছন্ন ! কেন নয় অজাতক, বিষে
কেন নীল নয় ঐ সাগরের মৌনের মতন
উপরে উৎকণ্ঠা রেখে অন্তরে নিস্পৃহ, স্পর্শহীন ?
মনুমেনটের নিচে, শহরে-সংগ্রামে ঘরে-ঘরে
আজ বাংলাদেশ জুড়ে ভোজসভা ভেঙে ছোটে হাত.

স্তব্ধ বেল্‌সেজার রাজা জনগণশূন্য বাংলাদেশে ॥

□

মনুমেনটের নিচে দুপুরের সভা গড়িয়ে বিকেল ।
বিকেল গড়াতে-গড়াতে সন্ধে রাত । রাতে অন্ধকার থেকে
কড়া কিছু বাংলা শব্দ ভেসে আসে । কোনদিক থেকে
আসে ঠাহর হয় না । গর্জন ভেসে আসে ।
বিপ্লবের ফাঁকা ডাক ভেসে আসে ।
অনেকদিনই এসব শুনেছি । মনে হয়েছে কখনো,
সেই গর্জমান গলার শেষটা বুঝি অন্ধকার জনসভায়
লাফিয়ে পড়বে । রাজনীতির হিংসা আমার চিরদিনই
মন্দ লাগে । রাজনীতির আর ধর্মের ।
একরকম হিংসা দুটোরই ।

সেই হিংসা থেকে অনবরত কিছু ছবি আর ঘটনা ।
বিশেষ রকম রাজনীতিবিশ্বাসী ছেলেমেয়ের হিংস্র হাতের
ছবি মানুষের কণ্ঠের উপর ।
সেই চাপ দেখে পশ্চাদ্‌ভ্রমণ ।

রাখো তোমার উদ্যত পা

তুমি একটু থামো, তোমার দুপায় আমি নূপুর পরাই
তুমি থামো, এক পা তুলে রাখো আমার হাতের উপর
রেখার উপর, তালুর উপর, রাখো তোমার উদ্যত পা
ছুটন্ত এক নবীন ঘোড়া হঠাৎ যেমন থমকে দাঁড়ায়
তেমনভাবে, চোখের উপর, চিত্রকরের মাথার উপর
আকাশ জুড়ে থমকে দাঁড়াও স্থির যেন হিম পাথর তুমি
এক এক রেখায় তোমায় ফোটাই, ফাটাই তোমার দাপট নখে
চোখ দুটোতে কাজল ঢেলে, করমচা ফল করবো গুঁড়ো
উড়াল দুপথ—আমার মায়ার দণ্ড ছুটবে পাহাড়চুড়োয়।

তুমি একটু থামো, দাঁড়াও, যেভাবে কাল দাঁড়িয়ে পড়ে
যেন শকট, সামনে বাধা নদী কিংবা সমুদ্দুরের
যেন বিপুল বাঘের মাথা তাঁদারিখেকো আলোক গিলো.
তুমি থামো, রাখো আমার হাতের উপর প্রতিশ্রুতি
রেখার উপর, তালুর উপর, রাখো তোমার উদ্যত পা ॥

□

ঘোড়ার মতন ঘুরে দাঁড়াবে দুরন্ত রমনীমূর্তি। উদ্যত পা হাতের উপর রাখতে বলা হচ্ছে। চিত্রকর বা ভাস্কর বা অগ্রসরমান প্রেম এই আকাশজোড়া শিল্পকাজের কাছে, চেহারায় যতোটাই ছোট মনে হোক—স্রষ্টার অহংকারে সে-ও জ্বলন্ত। তার বড়োত্ব বিরাটত্ব পাহাড়প্রমাণ পাথরে নয়, দীপ্তিতে, তেজে। হাতের সামান্য ছেনি, তুলি, বাটালি নেই স্থূল পাথরকে শিল্পে উন্নত করছে। নয়তো পাথরের মূল্য কী? তেমনি নারী। ছেনির ঘা, প্রেমস্পর্শ না পেলে জাগ্রত নয়, শিল্পও নয়। মাথার উপর ঘুরিয়ে একধরণের জালফেলার স্থিরচিত্র আমায় ভীষণ টানে চিরকাল। ছুটন্ত অশ্বমূর্তিকে কে যেন মাথায় ঘুরিয়ে আকাশজোড়া রাখতে বলেছে। নিচে একরত্তি অশ্ব জ্বলন্ত বিদ্যুৎরেখায় কবি। হাতে ছেনি, বাটালি—এইসব। অন্তর্গত শক্তিতে ঘুমভাঙাচ্ছে পাথরের।

শুয়ে আছি

শুয়ে আছি নদীর নীল জলে ঝিনুকে মুক্তোর পাশে, মাথার কাছে
লণ্ঠন, লণ্ঠনের ভিতরে মৌমাছি, মৌমাছির ভিতরে সাহানা দেবীর গান
আমার অভিমানের বদলে আজ, তার ভিতরে পোড়া চশমার
খাপ, সেখানে বৃদ্ধার মুখের শ্মশানের ভাঁজ, ঝিনুকের অন্যপাশে ও
শুয়ে আছে, চোখের উপর ভেসে বেড়াচ্ছে শ্রীচৈতন্যের গৃহত্যাগের
ফটোগ্রাফ—শুন্য বিছানা, বুদ্ধদেব যখন আহত মরাল বুকে
তুলেছেন আমি একটি বেথেলহেম-ফুলের পাতা পুঁতেছিলাম টবে,
এখান থেকে রাঁচী যাবার সহজ রাস্তা আমি জানি, আলাদা একটি
টুরিষ্ট আপিস খোলার জন্যে তদবির করতে গিয়েছিলাম ডালহৌসী
পাহাড়, সেখান থেকে আলমোড়া, সেখান থেকে সুনীলের কাছে
গিয়ে স্পর্শাতুর স্কচ মদ খেয়ে এসেছি আমি, মুসলমান ছেলের সঙ্গে
ঘুরে ঘুরে কুমীরের ব্যবসা করেছি, ঐ ব্যবসা থেকে কোনো পরিচ্ছন্ন
মেয়ের সঙ্গে সংসার গড়ে তুলবার সাধ হয়েছিল আমার, একটি পা-
ভাঙা চেয়ার পেয়েছি বারান্দার জঙ্গল থেকে, টিনের সুটকেশ
পেয়েছি, রাংতা পেয়েছি, তালের পাখা পেয়েছি।

এবছরে ঘটনা দ্রুত ঘটে গেলো, ঘটনা আর ঘড়ি মিললো না
কিছুতেই, এবছর চাষিদেরও শ্রমদান হলো খুব, এবছর প্রচুর পাওয়া
গেলো চিঠিচাপাটি, গত দিন কয়েক শুয়ে থাকার সময় পেয়েছি
সবেমাত্র, আমি বসে-দাঁড়িয়ে কিছুই ভাবতে পারি না কখনো।
শুয়ে আছি নদীর নীল জলে ঝিনুকে মুক্তোর পাশে—কে আপন
আমার ? ক্ষতির কথা বর্ণনা করাই আমার কবিত্ব, এছাড়া সহস্র
রকমের কবিত্ব তোমরা কত না করেছো ! তোমাদের কাছে গেলে
আমার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে।

গাছের ভিতরে যাওয়া আসা করার জন্য আমি নতুন ভাবে
উপাসনা শুরু করেছি কাল থেকে, কাল থেকে মাইল-পোষ্টে নম্বর
বসানোর কাজ পেয়েছি আমি এক, হাওড়া-ব্রিজ রঙ করার জন্য
এবছরেও কারিগরের নিমন্ত্রণ ছিলো। ঝিনুকের ভিতরে একটি ছোট
ও সুঠাম গ্রাম বসানোর চেষ্টা আছে আমার, তার পূবদিকে থাকবে
নদী—পশ্চিমে পাহাড়, হৃদয়ের কাছে ইস্কুল পাঠশালা থাকবে না
কোনো, সহশিক্ষার ব্যবস্থা, আমার তো মনে হয়, না থাকাই ভালো,
এই গ্রাম পাতার কাজে উঠে পড়ে লেগে যেতে হবে স্থির করেছি,
অনেকদিন বাদে আমাকেও বলবে লোকে 'কর্মবীর আলামোহন
দাশ,' কেউ বলবে অবিনাশবাবু, কেউ বলবেই না কিছু।

শুয়ে আছি নদীর নীল জলে ঝিনুকে মুক্তোর পাশে—আমাদের
স্বভাব নয় দরজা বন্ধ করা! আমাদের বাড়ীতে বেশ হোটেল-
হোটেল ভাব থাকবে একটা—এরকমই চাই, ও বলেছিলো জানলায়
ভয়েলের পর্দা লাগাতে। আমি চোখ পাকিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে
বলেছিলাম 'ভুলে গেলে?' ধরামাত্রই ভেড়ার গায়ের পশম
মেয়েমানুষ নিজের জন্য ব্যবহার করে, দখলের পর এই স্বার্থপরতার
জন্য আমি চিরদিন জ্বালিয়ে রাখলাম স্টপ. স্টপ ···

এবার তোমাদের কথা কিছু বলার জন্য আমি বদ্ধপরিকর—
তোমরা বহুদিন যাবৎ এদেশে আছো, তোমরা লোক ভালো
একথা অনেকেই জানে, অনেকেই জানে তোমাদের সঙ্গে আমাদের
আত্মীয়তা আছে।

অন্ধকার দেয় তারো বেশি

উজ্জ্বলতা কতটুকু দিতে পারে, যা দেয় আঁধার !
যা দেয় আঁধার, পাপ, ছিন্নমুণ্ড, নরকের ধোঁয়া
উজ্জ্বলতা দিতে পারে সেই সব ?   দিতে পারে নাকি ?

রোদ্দুর অনেক দেয়, অন্ধকার দেয় তারো বেশি—
ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন মাংস রেখে দেয় মাটির ভিতরে
মানুষের মজ্জা পোড়ে শ্রদ্ধাময় অন্ধকার জ্বরে
রোদ্দুর অনেক দেয়, অন্ধকার দেয় তারো বেশি।

প্রেম কিছু দেয়, কিন্তু প্রেমের হীনতা দেয় খুব
বিরহ, গোপন মেঘ, হিংস্র থাবা, জিহ্বা ও যন্ত্রণা
পর্যুদস্ত করে দেয় আনন্দে আনন্দে সারাদিনই—

রোদ্দুর অনেক দেয়, অন্ধকার দেয় তারো বেশি !

□

উজ্জ্বলতা, রোদ্দুর, প্রেম—এদের দেওয়া পর্যাপ্ত আর স্বাভাবিক
এদের দান সাধারণ দান।   কিন্তু, যার দেবার কথা নয়—সেই
অন্ধকার বা বিরহ বা সমশ্রেণীর কেউ—সে দেয় অনেক বেশি।
সবাইকে দেয় না।   যে নিতে পারে, তাকেই দেয়।

ঘরে ফেরা

পা তুলে যে শূন্যে রাখো, তা কোন পাথর ধরবে হাতে ?

ঝর্নার উচ্ছন্ন জল, রাঙা মাছ গোধূলির আলো
ধারাবাহিকতা নিয়ে পড়ে আছে সেগুনের ছায়া
বৃষ্টি হলে এই দেশ মানুষের ভিতরের কালো
মুছে নেয়, টিলা থেকে সরে যায় হিংস্র দুটি চোখ
মানুষ সাঁতারে নামে, ঝর্নাজল করে লাফালাফি
শুঁড়িপথে চলে যায় ওরাঁও যুবক
কাঁধে টাঙি
যতোবার ভুল ভাঙি, ততোবারই ভুল পথরোধ
করে যেন চাঁদ, যেন সহসা চিতার ছায়াগুলি
হলুদে কালোয় মেশা মাতাল খটিক বনবাসী
—এইসব।

পা তুলে যে শূন্যে রাখো, তা কোন্ পাথর ধরবে হাতে ?
পাথরের হাত আছে ? হাতের আদরযত্ন আছে ?
পাথরের কী আছে যা তোমায় সস্নেহে কোলে নেবে ?
চোখ খুলে দ্যাখো, আমি শূন্যহাত বাড়িয়ে রেখেছি,
সামনে ঝর্নার জল, রাঙা মাছ, খেলাঘর, নুড়ি—
খেলা হবে, রেলা হবে, তবে তো সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা !

‘পা তুলে যে শূন্যে রাখো’ এই লেখাটির পরের লেখা— আনেকদিন পর ভিতর থেকে বাইরে এসে ‘রাখো তোমার উদ্যত পা’ হয়ে অকস্মাৎ দাঁড়িয়েছে। দুটি লেখাতেই ঘোড়ার ছুটন্ত কদম। শূন্যে পা তোলা। রমণী যদি পদাঘাত করে, গল্পে-আখ্যানে কোনো কথায় যেমন, তখন নাকি ছবি, এই ঘোড়ার কদমের মতন হবে ? ঘোড়ার এই স্থগিত ভাব ঘুরে-ফিরে প্রেমের চূড়ান্ত বলে মনে হয়েছে আমার। নিচ দিয়ে ঝর্ণা আর ঘনাংশ চাঁদ চিতা। হাত বাড়িয়ে রেখেছি আমি। পাথরের মতন হয় বিশ্বাসী হাত ! তাতে পা দাও। গ্রহণ হোক। খেলাধূলা হোক।

কেন যাবে ?

শুধু কি আমাকে তুমি ছেড়ে যেতে পারো ?
ছেড়ে যেতে হবে এই ঘরবাড়ি, দেয়ালের লতা
নারকেল সুপারিবন কিংবা এক জীবন ব্যর্থতা
এই সব, সমস্তকে—তাহাকে তো ছেড়ে-আসা বলে !
ছেড়ে-আসা, পথে-ভাসা, নিরুদ্দেশ সম্ভব-সজলে ।
শুধু কি আমাকে তুমি ছেড়ে যেতে পারো ?
কিছুতে পারো না যেতে পিছে ফেলে স্মৃতির তরণী—
যা কিছু সঞ্চয়, লোভ, গুরুতর জীবন পিপাসা—
তার মধ্যে পড়ে আছে, কী সে যাবে ?   কোন্ ভাবে যাবে ?
যেতে গেলে এইসব ছোটখাট ব্যথায় জড়াবে—
কেন যাবে ?   কেন ছেড়ে যাবে ?

□

আলাদা ক'রে একজনকে ছেড়ে যাওয়া যায় না ।   ছাড়তে গেলে, পারিপার্শ্বিকসমেত ছেড়ে যেতে হয়—অন্যকিছু, অন্যকোন পারিপার্শ্বিকে ।   ছেড়ে-আসার মানেই তাই ।   কিংবা এই মানে নিয়ে ধন্ধ আছে ।

আমি মানে আমি বা যে কোনো পুরুষ ।   ছেড়ে যে যাবে, তার নাম মূলত নারীই ।   ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকে অংকের মতো স্বাভাবিক ধরে নিলে—কী সে যাবে ?   কোন্ ভাবে যাবে ?—এ ধরণের প্রশ্ন অর্থহীন হয়ে পড়ে ।   তবু, প্রশ্ন থেকে যায় ।   প্রশ্নের মধ্যে তখনো প্রেমের মায়া জড়ানো ।   এবং শেষত, ক্রন্দন ।   কেন যাবে ?   কেন ছেড়ে যাবে ?

ছেড়ে যেতে গেলে ব্যথায় জড়ানোর যে কষ্ট, সেই কষ্টটুকু যদি না হয়, তাহলে যথেষ্ট ।   বিচ্ছেদ যে এই সামান্য উপহার দেবে—প্রেম তা জানে ।

সে এসে দাঁড়িয়ে আছে

সে এসে দাঁড়িয়ে আছে।
দীর্ঘদিন হাঁটেনি বলেই—অনেক হাঁটার কষ্ট
সে পেয়েছে আজ, এইখানে।
কেন যে এসেছে, আছে, সে জানে না।
          কেন যে এসেছে ?
চায়নি কখনো কিছু, চাওয়ার অভ্যাসও তার নেই
আমার দিতেও আজ বাধে
কাউকে কিছু কি আর দেওয়া যায় ?   দিতে লাগে ভালো ?
দুজনে আনেক আগে দুইদিকে বেরিয়ে পড়েছি।

সে এসে দাঁড়িয়ে আছে।   আমার যাবার শক্তি নেই ॥

□

এখানে দুজন অর্থে পৃথক দুজন নয়—একজনেরই দুটি ভাগ। এক অর্ধ দাঁড়িয়ে থাকে। কারোর জন্যে অপেক্ষা তার। অন্য অর্ধ তার পাশে এসে দাঁড়াতে পারে না। তার ভিতরে এসে শুয়ে পড়তে পারে না। দুই, এক হতে অনেক বাধা। তত্ত্বকথা নয়। নির্লিপ্তভাবে, দুজনকে আলাদা করে দেখানো হলো। এবং অনেকসময়, বোধহয় সবসময়ই, এই দুটি ভাগে মেলানো কঠিন হয়ে পড়ে। প্রেমেও মেলেনা। হয়তো শেষমেষ মৃত্যুতে গিয়ে মেলে-মেশে।

কৌটো আর সিঁদুরদান

বারো ডজন পাতাল আমি বুকের মধ্যে গেঁথেছিলাম
হাটের মতন দরজা-জানলা ঘাটের মতন গবাক্ষ তার
বারো ডজন পাতাল আমি বুকের মধ্যে গেঁথেছিলাম
অনেকদিন অনেকদিন অনেকদিন তোমার খবর
পাইনা হলো অনেকদিন, এখন শীতের ভোরের বেলা
তোমার কোট প্যাণ্টালুন মাঠকোঠায় মনে পড়ছে
দশটা তাঁবু পাতা ছিলো দক্ষিণের ডিসির মাঠে
দশটি রোরো নদী চলছে দক্ষিণের মাঠের ভিতর
তোমার কোটপ্যাণ্টালুন মাঠকোঠায় মনে পড়ছে
হায়রে হায় হায়রে হায় হায়রে হায় শীতের ভোর
আঙুলগুলো শীতে কাঁপছে গলার স্বর শীতে কাঁপছে
পড়াশুনোও শীতে কাঁপছে গায়ের চাদর শীতে কাঁপছে
সারারাতের তাড়া খাওয়া স্বপ্ন আমার শীতে কাঁপছে
সারারাতের স্বপ্নে স্বপ্নে চুমু খাওয়াও শীতে কাঁপছে
একটি ঘর মাঠকোঠায় কবুতরের ডানার ভিতর
গল্প গল্প গল্প গল্প টেবিল জুড়ে হাতের লাইন
রেলগাড়ির ভাসা বাড়ির ভোররাতের শীতে কাঁপছে।
চায়ের কাপে এধার ওধার দুটি মুখের ওষ্ঠ অধর
জমে যাচ্ছে, বরফ হচ্ছে ভিতরময় চায়ের লক্ষ্য—
কেবল দুটি মুখ দেখছে পরস্পর চোখে চোখে
ভিতর ভরা চায়ের লক্ষ্য তাদের প্রীতিপূর্ণ সুখে
হায়রে হায় হায়রে হায় হায়রে হায় বুকে ফুটছে
বারো ডজন পাতাল যার হাটের মতন দরজা জানলা
বারো ডজন পাতাল আমি বুকের মধ্যে গেঁথেছিলাম

কোথায় গেলো কোথায় গেলো পাতালভরা কালো গভীর
চোখের ভিতর চূর্ণসাজের মিহিজামের ভালোবাসা
চোখের ভিতর মুখের ভিতর বুকের ভিতর জিভের স্বাদ
বারংবারই পেয়েছিলাম — শেষ হয় না শেষ হয় না
চোখের ভিতর মুখের ভিতর বুকের ভিতর শেষ হয় না
শুধু আমার যৌন হাত আলিঙ্গন যৌন হাত
খুঁজে পায় না খুঁজে পায় না চমকদার ভালোবাসার
কৌটো আর সিঁদুরদান কৌটো আর সিঁদুরদান।

□

একটি পুরণো প্রেম ছিলো। অনেকদিন তার খবর ছিলো না। তার জন্য সিঁদুরকৌটো কেনা ছিলো। অর্থাৎ, ঘটনাটা বৃত্ত তৈরি হবার মুখোমুখি যখন—হাওয়ায় সুতো ছিঁড়ে গেছে, গোল ঢোল ভাঙচুর তছনছ। স্মৃতি শরীর নিয়ে সামনে পিছনে কোলাহল করছে, যেখানে আলিঙ্গন যৌনহাতের মধ্যে কৌটো আর সিঁদুরদান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সংসাবের ছিরিটাই বা কী ?—বারো ডজন পাতাল যার হাটের মতন দরজা জানালা! মিহিজামের ভালোবাসা—একটা কথার কথা। গোটা লেখার মধ্যে একটা কষ্টকর যন্ত্রণা সমুদ্রতীরে ঢেউ আর সাদা ফসফরাস আগুনের মতন ছড়ানো। গোপালপুরে সাতদিনের মধ্যে একদিনে লেখা। একদিন দুপুরে, সামনে ভাঙা এ্যাঙ্কোরেজের ছবি। এ্যাঙ্কোরেজ হোটেল। এখন সেখানে কোন সংসার নেই। থাকে না।

তুমি যেন গাছ

তুমি যেন গাছ, যার ডাল এসে পড়েছে মাটিতে
ছায়া নিয়ে, মায়া নিয়ে, পরিচ্ছন্ন ফুল পাতা নিয়ে।
নিশ্চিত কখনো ঝরে, ঝ'রে পড়ে সময়ের হাতে—
তুমি যেন গাছ, যার ডাল এসে পড়েছে মাটিতে।
যখন যেভাবে ঝরে, ফিরে গড়ে ঠিক সেইভাবে!
কিছু ছোটবড়ো নয়। কিছু নয় নবীন, পুরনো।
তুমি জানো, তুমি ঠিকই জানো।

আমার দূরের অনুমান।

তুমি যেন গাছ, যার ডাল এসে পড়েছে মটিতে—
বাতাস হয়েছে তীব্র, ছায়া আছে, রোদ আছে রাতে !
একী সত্য ?   একী মায়া ?   থাকে শুদ্ধ কবিতা জানাতে

□

এই গাছ, গাছের আদলে রমনীমূর্তির দেওয়ার রূপ কবিতার মধ্যে-- এই দেওয়া ডালপালার হাতে, ছায়া মায়া ও পরিচ্ছন্নতা মিলিয়ে এই দেওয়ার আরেক নাম প্রেম ও সংসার। গারস্থিও বলা যেতে পারে।

ঝরা আর গড়ে ওঠার মধ্যে যেমন গাছ, তেমন রমনীও। দেওয়া-পাওয়ার মধ্যে অবমাননা নেই। নতুন পুরনো নেই। রমনীর পক্ষে জানা সম্ভব। যে দেয় এবং যে পায়—তারই হিসাব। পুরুষ দূর থেকে অনুমান করে। তার দেওয়া ও পাওয়ার তেমন হিসাবনিকাশ থাকে না। এই তার চরিত্র।

ছায়া মায়া পরিচ্ছন্নতা ছাড়াও রাতের রোদ্দুর আছে ! সেই রোদ্দুরের অর্থ কী ? প্রকৃত রোদ্দুর আছে কিনা—এসমস্ত শুদ্ধ কবিতা, (অপরিশুদ্ধ কবিতা নয়) জানাতে পারে। আর কেউ নয়। পারে কি ? পদ্যশেষের এই প্রশ্ন গোটা লেখার মধ্যে মুখ লুকিয়ে।

এবার থেকে

চতুর্দিক ঘুরে বেড়ালে বাড়ির ভিতর বাড়ির বাইরে
যার আড়ালে গেলে—তাকে ডাকলে কেন ?
এবার থেকে—যেবার তোমার সত্যমিথ্যা
তুই স্বরূপের একটি ভাঙলে
এবার থেকে দেবার যা সব দিয়েই দিও
যেন রাখলে রাখা যেত
বাবার সুনাম গাঁটের পয়সা ভাড়াবাড়ি
এখন বেড়াল দেখতে—দেখতে
কলুটোলার উল্টোফুটে চীনের রাত্রি
মধু মধুর মাধুরীদের চেয়েও ভালো
ভালোবাসার চেয়েও ভালো
ধরা গলার গানের চেয়ে, পুলিশ পুলিশ হুপিং-কাশি
ততক্ষণে মাথার ভেতর
যতক্ষণে পুলিশ পুলিশ
দেয়াল থেকে দেয়ালগুলো
খুলে যাচ্ছে, গায়ের ভেতর
আরশুলাদের প্রেমনিবেদন
তোমার স্মৃতি চাপিয়ে দিচ্ছে ম্যালেরিয়ার রুগীর মতো
উল্টোপালটা লেপতোষকে
তোমার স্মৃতি, ভালোবাসাব, ম্যালেরিয়ার
হায় পুরাতন বাবার ফোটো
বাবার গোঁফের মতন যত্ন
পাবো কোথায় ? তেমন কাঁচি
পকেট কাটে, ন্যায্য মাংস
পীরিত কাটে সাপের ছুরি
ওঝার পরামর্শমতো !

ঘুরে দেখলাম চতুর্দিকে
বাড়ির ভেতর বাড়ির বাইরে
আড়াল আড়াল …দরজা বন্ধ
এবার থেকে—যেবার তোমার সত্যমিথ্যা
এক স্বরূপের দুইটি ভাঙলে
এবার থেকে দেবার যা সব দিয়েই দিও…

□

একটা সময়ে কলকাতার কানাগলিতে পায়ে ঘুঙুর, মুখে চোঙা—‘চানাচ্চুর গরম’ আওয়াজ ঝমঝমিয়ে ঘুরে বেড়াতো, বিকেল হতে-না-হতে। সেই আওয়াজ, সেই স্মৃতির হাত ধরে কথাগুলো ঝমাঝ্‌ঝম বসে গেছে। এক পংক্তি থেকে অন্য পংক্তির তেমন প্রকাশ্য নামা নেই।

আবোল তাবোল নাচের পায়ে উঠতে-নামতে গিয়ে লেখাটা—‘এবার থেকে দেবার যা সব, দিয়েই দিও’…তে এসে থেমেছে। থেমেছে এবং থামেনি। যার আড়ালে গেলে, তাকেই আবার ডাকলে—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে-খুঁজতে কানাগলি পাক দিয়ে চানাচুরঅলার বেরিয়ে যাবার মতন হঠাৎ লেখাটি এক জায়গায় থেমে গেলো…

সুন্দর

সুন্দর আমার কাছে শুয়ে আছে মানুষের মতো—
এই দেখে আমি তার পাশ থেকে দ্রুত উঠে পড়ি
এবং পালিয়ে যাই ঘর থেকে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে—
সুন্দর কীভাবে থাকে তখনো আমার কাছে থেমে !
সেও কি সুন্দর, ওই আগেকার মানুষের মতো ?

◆

সুন্দর যেন মানুষ নয়, মানুষের মতো ! এমন এক বিশ্বাস আমায় মাঝে মধ্যে পেয়ে বসে। আগে এক সুন্দর আমার কাছে শুয়ে থাকতো। আমার পাশে। কখনো-সখনো। তখন আমাকেও সুন্দর দেখাতো। আমাকে মাঝেমধ্যে খুব অসুন্দর দেখায়।

আপন মনে

আমার ভিতর ঘর করেছে লক্ষ জনায়—
এবং আমায় পর করেছে লক্ষ জনে
এখন আমার একটি ইচ্ছে, তার বেশি নয়
স্বস্তিতে আজ থাকতে দে না আপন মনে ॥

□

লক্ষ জনে আমার ভিতর ঘর করেছে, লক্ষ জনে পর করেছে। আমার একটি ইচ্ছা, স্বগতোক্তির মতো—আপন মনে থাকার যারা থাকতে দিচ্ছে না, তাদের কাছে আমার এই সামান্য নিবেদন বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে।

সম্পর্ক

ভেঙে দেবো—সবাই যে ভাবে ভাঙে, সেভাবেও নয়
পরম আদরে ভাঙবো, যত্নে ভাঙবো, নেবো কোলে তুলে-
তারপর দুহাতে মুখ প্রতিষ্ঠিত ক'রে দেবো টিপে
সচেতনভাবে দেখবো—কীভাবে সম্পর্ক চলে যায়—
হায় মানুষের প্রেম, গেরস্থালি, জন্মদিনগুলি !

□

সম্পর্ক নিয়ে কবিতা-গল্প। সম্পর্কের যোগ এবং বিয়োগই আমার একা কেন, সবাইকে লেখায়। তেমন এক সম্পর্ক—যাকে জোড়া দেবার ইচ্ছে এবং কখনো ভাঙার ইচ্ছে, আমার ভিতর। আদর ক'রে কোলে নিয়ে তার অর্থাৎ সম্পর্কের গলা টিপে মারা। তেমন মৃত্যু আর চলে যাওয়ার ভিতরই আমি, আমার জন্মদিন, প্রেম, গেরস্থালি।

অসুখ

আমার এখন ভারি জবরদস্ত অসুখ—
কপালের ওপর খাড়া চুল, মাথা ভর্তি উকুন
উলুবনে রাশি রাশি রাক্ষুসে পিঁপড়ে।

বৃষ্টি দেরিতে আসবে
খুব দেরিতে আসবে
আমার এখন ভয় দেখাতে ভালো লাগে
শুধুই ভয় দেখাতে ভালো লাগে।

□

একটি ভিখারির অসুখের চেহারায় আমাকে দেখতে পেলাম, একদিন। মাথা ভর্তি রুখু চুল। চুলে উকুন—এইসব। পুরনো ব্যাপার। উলুবনে পিঁপড়ে ছড়ালে যেমন মূল খেয়ে যায়, তেমনি মাথার মাস আমার খেয়ে যাচ্ছে। পিঁপড়ের মতন মৃত্যু। মাথার সামনে, পিছনে—সর্বত্র।

দিগন্তে, মাঠের প্রান্তে

দিগন্তে, মাঠের প্রান্তে জ্যোৎস্না আজি করে মাখামাখি
তুমি নিরুত্তর, দূরে বাব্‌লা ভরে ফেলিছে জোনাক
থেকে থেকে বহু দূরে টায়ার ফাটার শব্দ হয়
বাব্‌লার ভিতরে যেন বসে গেছে গোপন বাজার।

আমি ভালোবাসিয়াছি নারী ঢের, কিশোরের কাছে
দেহের গঠন তুলে ধরিবার অভিলাষ আছে
দিগন্তে, মাঠের প্রান্তে, জ্যোৎস্না আজি করে মাখামাখি
দিগন্তে মাঠের প্রান্তে জ্যোৎস্না আজি করে মাখামাখি ॥

□

গোপন বাজারের মতন মিটমিটে জোনাক আমি বাব্‌লা গাছ ভরা দেখেছি। নারী ঢের দেখেছি। মাঝেমধ্যে কিশোরের কাছে সেই দেহের গঠন তুলে ধরার অভিলাষ আছে। জ্যোৎস্না আর দিগন্তের মাখামাখি আমার ছেলে বেলার প্রিয় দৃশ্য।

আমিও

আমিও মৃত্যুর কাছে, মৃত্যুর বিকল্প দিতে চাই।
আমাকে অপরিমেয় মহিলার ধাতু দিতে পারো
অথবা পোস্টম্যান ক'রে দাও সব পুরনো চিঠির
পিস্তল দিও না হাতে, যাতে তার পদতল ছিলো।

□

মৃত্যুর কাছে আমার মৃত্যুর বিকল্প কিছু দেবার ইচ্ছে বহুকালের। বিকল্পে সে মৃত্যুর চেয়ে কঠিন আর ভয়ংকর কিছু হবে। আমি যে মৃত্যুর কথা বলি—সেই মৃত, তথাকথিত মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকবে। ভূত হয়ে নয়। বিভীষিকা হয়ে নয়। এও একধরণের সুন্দর।

বাহিরে বৃষ্টির শব্দে

বাহিরে বৃষ্টির শব্দে মনে পড়ে তোমাকে আমার
মনে পড়ে বৃষ্টি হতো দূর ছোটনাগপুর পাহাড়ে
অন্তরে হতো না বৃষ্টি সেই সব অন্তরঙ্গ দিনে
তুমি কাছে থেকে তার পথরোধ করেছিলে খুবই।

এখন, অনেক দূরে·· শালগাছগুলি একা নয়
স্মৃতিও জড়িতভাবে মেনে নেয় তোমার জ্যোৎস্না
বৃষ্টি ও আমার মাঝে কবিতার খাতার উপরে
তোমারই দখল ছিলো নিরবধি, ভাগ্য হতে বড়ো !
সেইসব দিনগুলি কোথা গেলো, সেই শালগাছ
পাহাড়ে পাহাড়ে সেইসব মুর্তিমান ঝর্ণাগুলি
কোথায় হারিয়ে গেলো জনশূন্য বস্তুত সড়ক ?
তোমার ভিতরে আমি এইসব বর্ণনা দেখেছি।
প্রেমের গ্রন্থের প্রতি পাতাটি এরাই ভরেছিলো
আজ গ্রন্থটিকে কোথা ফিরাইব ?   বৃষ্টি ঝ'রে পড়ে।

□

একটি মেয়ে, কিশোরী—যাকে এককালে ভালোবাসতাম, যার জন্যে
কিছুকাল ছোটনাগপুর জঙ্গলে উঁচু নিচু ঘুরে বেড়িয়েছি।
তার ছবি।   প্রকৃতি এবং সে মিলেমিশে একাকার।

এরপর ওখানে রাখে না

আমার মতন একা থাকার জন্যে কেউ
এখানে আসে না। গাছগুলো আর পাথর
এবং জল পেলেই নদীগুলো চৌচির।
এখন নদীর মতো কথা শব্দ হয়ে ফোটে।
আকাশে চাঁদ ওঠে, একফালি
মিষ্টি কুমড়োর মতন বিচিভূতি-সুদ্ধু চাঁদ।
হাতায় ফাঁদ বনমুরগি ধরার জন্যে,
অরণ্যে এতোকাল ঘোরাফেরা করেও তাকে
বশে আনা গেলো না। আগুনে পোড়ালেও
ও তাকে মালা ক'রে তোলে, সোনার থালার
মতন চাঁদ পাবো বলেই এই একা আসা।
বাসা-ফাসা কিছু নেই। পথ থেকে পথে,
গাছপালার কোলে, গরিবের কম্বলে ঢুকে শীত
সম্বিৎ ফিরলেই শহরে। এরপর ওখানে আর
ওরা রাখে না॥

□

গাছপালা জল জঙ্গলের মধ্যে একা থাকতেই সবাই আসে। আমি বহুবারই একা থাকতে যাইনি। গোলমাল করতে গেছি। হৈ চৈ করতে গেছি। জঙ্গলে জ্বালাতে গেছি। তারপর সম্বিৎহারা হয়েছি। সম্বিৎ ফিরলেই শহরে ফিরেছি।

সম্বিৎ ফিরলে জঙ্গল কাউকে রাখে না। ফিরিয়ে দেয়।

ভাঙাবাড়ি সেদিন আরো দুরূহভাবে ভেঙে গেল

চিরদিন তোমার ভিতরে আমি ভাঙাবাড়ির স্পন্দন পেয়েছি টের
কোথায় দেয়াল ফাটিয়ে অশ্বথচারা বসে গেছে
আলো থেকে পালিয়ে বেড়ানো পাতায় মখমলের মতন কোমল মস্‌
সিঁড়ির মাঝখান ক্ষয়ে ধারায় ধারায় মানুষ নেমেছে কতো
সেদিনকার তাদের ওঠানামার কাহিনী গালগল্পের মতো
আমাদের মুখে ঘুরে বেড়ায়.

ঘুরে বেড়ায় আর ঘুরে বেড়ায় লালনীল ঝলমলে পোষাক—
পরিচ্ছদ কতকালের
তোমার ভিতরে আমি আমূল ভাঙাবাড়ির স্পন্দন পেয়েছি টের
পেয়েছি সেকালের সেইসব লালনীল ঝলমলে পোষাক পরিচ্ছদ—
ওঠানামা—অশথচারা
আলো থেকে পালিয়ে বেড়ানো পাতায় মখমলের মতন কোমল মস্‌
চিরদিন তোমার ভিতরে আমি ভাঙাবাড়ির স্পন্দন পেয়েছি টের
সেই ভাঙাবাড়ি আজ ততোধিক দুরূহভাবে ভেঙে গেছে
গোধূলির মুখোমুখি তার দুয়ার জানলা পড়ে আছে কৃপাণ-গোঁজা
সেনানীর মতো
রুদ্ধবাক, উচ্ছন্নহৃদয়
যার কেউ কোথায় থাকে না তারও বুকে
ভালোবাসার কথা পাখির মতন ভেসে বেড়ায়
আমি তোমার বুকের মাঝের সেই পাখিকে ভালোবাসতাম
ভালোবাসতাম তার চিরবিরহী ভেসে বেড়ানো—জলে স্থলে
একদিন ঐ ভাঙাবাড়িরই কড়ি-বরগা ইটকাঠের উপর হোঁচট
খেলো পাখি আমার
ভাঙাবাড়ি সেদিন আরো দুরূহভাবে ভেঙে গেলো ॥

□

ভাঙাবাড়ির ভাঙচুর নিয়ে এই লেখাটি নিজস্বভাবে তার ভীষণ নিজেই লিখেছে। একে বিষদ করার তেমন প্রয়োজন নেই। শুধু এই ভাঙাচোরা যেখানে দেখেছি—সেটি হলো জগৎশেঠের বাগান। সেই বাগান দেখে আমি অট্টালিকা, প্রাসাদ, হীরা জহরতের চরিতার্থতা খুঁজে পাইনি।